# আকাশ জোড়া মেঘ

হুমায়ূন আহমেদ

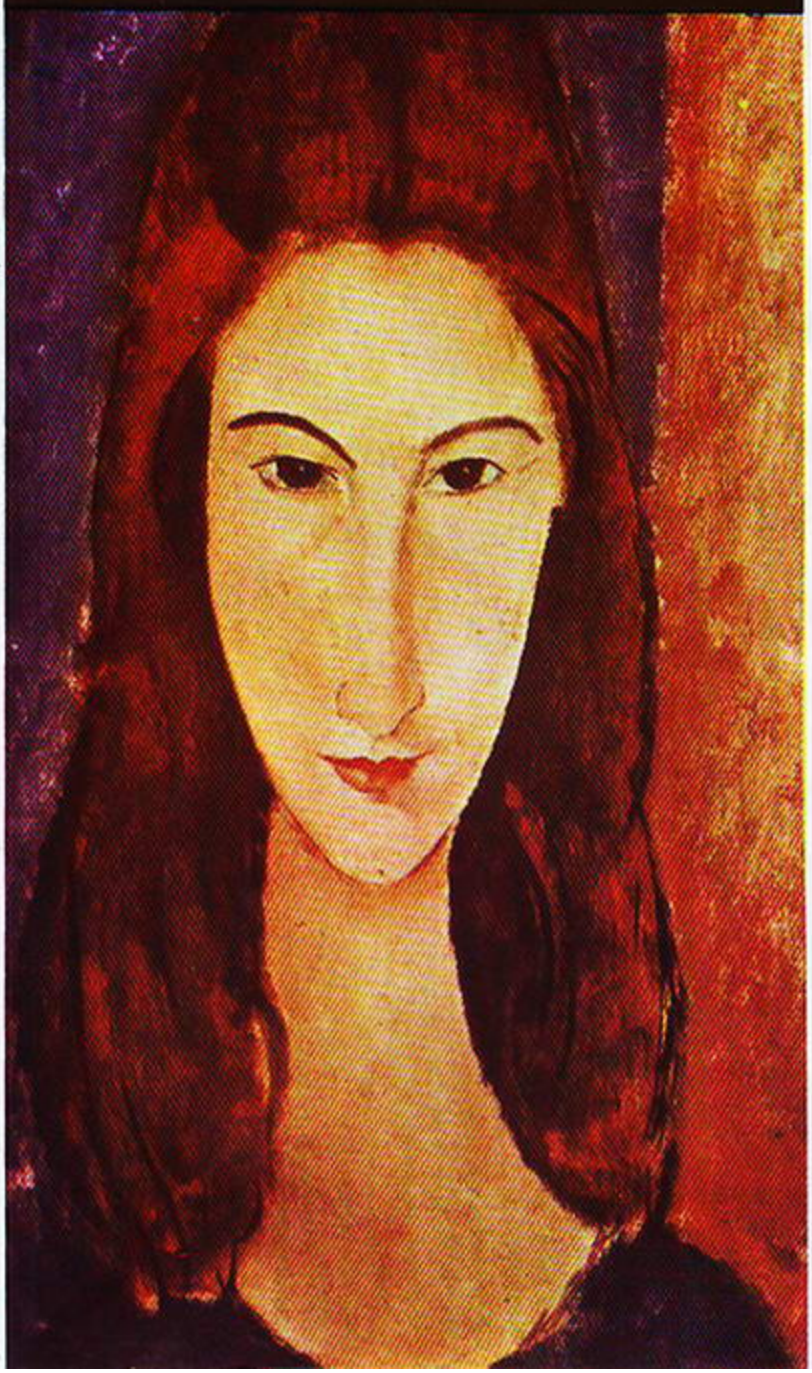

ছাপ্পান্ন মিনিট পার হল।

ফিরোজ বসে আছে। কারো কোনো খোঁজ নেই। ঘুমন্ত রাজপুরীর মতো অবস্থা। কোনো শব্দটব্দও পাওয়া যাচ্ছে না, যা থেকে ধারণা করা যায় এ-বাড়িতে জীবিত লোকজন আছে। সে যে এসেছে, এ-খবরটি ছাপ্পান্ন মিনিট আগে পাঠানো হয়েছে। বেঁটেখাটো এক জন মহিলা বলে গেল—আফা আসতাছে। ব্যস, এই পর্যন্তই। ফিরোজ অবশ্যই আশা করে না যে, সে আসামাত্র চারদিকে ছোটাছুটি পড়ে যাবে। বাড়ির কর্তা স্বয়ং নেমে আসবেন এবং 'এনাকে চা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?' বলে চেঁচামেচি শুরু করবেন। তবে এক ঘন্টা শুধুশুধু বসে থাকতে হবে, এটাও আশা করে না। সময় এখনো এত সস্তা হয় নি।

'আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন?'

পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ফিরোজ মনে-মনে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। চমৎকার মেয়েগুলি সব এমন-এমন জায়গায় থাকে যে, ইচ্ছা করলেই হুট করে এদের কাছে যাওয়া যায় না। দূর থেকে এদের দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হয় এবং মনে-মনে বলতে হয়—আহা, এরা কী সুখেই না আছে।

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। সালামের মতো একটা ভঙ্গি করল। এটা করতে তার বেশ কষ্ট হল। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে এ-রকম সম্মানের সঙ্গে সালাম করার কোনো মানে হয়।

ফিরোজ বলল, 'আমি আপনার বাবার কাছে এসেছি।'

'বাবা তো দেশে নেই, আপনাকে কি এই কথা বলা হয় নি?'

'হয়েছে।'

'তাহলে?'

মেয়েটির চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। যেন কৈফিয়ত তলব করছে, কেন তাকে

ডাকা হল। ফিরোজ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনার বাবা নেই বলেই আপনাকে খবর দিতে বলেছি। গল্পগুজব করার উদ্দেশ্যে খবর দেয়া হয় নি।'

অপালা পর্দা ছেড়ে ঘরের ভেতর ঢুকল। লোকটিকে চট করে রেগে যেতে দেখে তার বেশ মজা লাগছে। বয়স্ক মানুষেরা মাঝে-মাঝে খুবই ছেলেমানুষি করে।

'আপনার বাবা আমাকে কমিশন করেছেন বসার ঘরটি বদলে নতুন করে সাজিয়ে দিতে। এই সাজ তাঁর পছন্দ নয়।'

'আপনি কি একজন আর্টিস্ট?'

'না। আর্টিস্টরা মানুষের ঘর সাজায় না। তারা ছবি আঁকে। আমার কাজ হচ্ছে আপনাদের মতো পয়সাওয়ালাদের ঘর সাজিয়ে দেয়া।'

'বেশ, সাজিয়ে দিন।'

'আপনি জানেন তো, আপনার বাবা ড্রইংরুমটা বদলাতে চাচ্ছেন?'

'না, জানি না। বাবার মাথায় একেকটা খেয়াল হঠাৎ করে আসে, আবার হঠাৎ করে চলে যায়। আপনি বসুন।'

ফিরোজ বসল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। এইসব পরিবারের মেয়েরা অসম্ভব অহঙ্কারী হয়। এক জন হাউস ডেকোরেটরের সঙ্গে এরা বসবে না। এতে এদের সম্মানের হানি হবে।

'আমি ভাবছিলাম আজই কাজ শুরু করব।'

'করুন।'

'আপনার বাবা আমাকে টাকাপয়সা কিছু দিয়ে যান নি। জিনিসপত্র কিনতে আমার কিছু খরচ আছে।'

'আপাতত খরচ করতে থাকুন। বাবা এলে বিল করবেন।'

'এত টাকা তো আমার নেই। আপনি কি কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'আমি কী ব্যবস্থা করব?'

'আপনার বাবা বলেছিলেন, 'যে-কোনো প্রয়োজনে আপনাদের এক জন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে-নিশানাথবাবু। কিন্তু তাঁর ঠিকানা আমাকে দিয়ে যান নি।'

'আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ম্যানেজার কাকুকে খবর দিয়ে নিয়ে আসছি। আপনাকে কি ওরা চা দিয়েছে?'

'না।'

'চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনার অসীম দয়া।'

অপালা হেসে ফেলল। অসীম দয়া বলার ভঙ্গির জন্যে হাসল, না অন্য কোনো কারণে, তা বোঝা গেল না। সে দোতলায় উঠে ম্যানেজার সাহেবকে টেলিফোনে আসতে বলল। নিশানাথবাবুকে এ-বাড়িতে সবাই ম্যানেজার ডাকে, তবে ম্যানেজারি ধরনের কোনো কাজ উনি করেন না। উনি বসেন মতিঝিল অফিসে। গুরুত্বহীন কাজগুলি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করেন। টাটকা মাছ কেনার জন্যে প্রায়ই ভোররাতে দাউদকান্দি চলে যান। এই জাতীয় কাজে তাঁর সীমাহীন উৎসাহ।

অপালার টেলিফোন পেয়েই বললেন, 'এক্ষুণি চলে আসছি মা। এই ধর পাঁচ

মিনিট। এর সঙ্গে আরো দু'মিনিট যোগ করে নাও, রাস্তাঘাটের অবস্থা তো বলা যায় না! ঠিক না মা?'

'তা তো ঠিকই।'

'এক মাইল চওড়া রাস্তা; এর মধ্যেও ট্রাফিক জ্যাম। দেশটার কী হচ্ছে, তুমি বল? একটা অনেস্ট অপিনিয়ন তুমি দাও . . .

নিশানাথবাবু বক-বক করতে লাগলেন। তিনি দশ মিনিটের আগে টেলিফোন ছাড়বেন না। কথার বিষয় একটিই-দেশ রসাতলে যাচ্ছে। মুক্তির কোনো পথ নেই। দেশের সব ক'টা মানুষকে বঙ্গোপসাগরে চুবিয়ে আনতে পারলে একটা কাজের কাজ হত ইত্যাদি।

অপালা রিসিভার কানে নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল কখন বলা যাবে, কাকা, টেলিফোন রাখলাম।

ফিরোজ ভেবেছিল একটি খুব সুদৃশ্য কাপে এক কাপ চা-ই শুধু আসবে। অন্য কিছুই থাকবে না। অসম্ভব বড়লোকরা এককথার মানুষ—যখন চায়ের কথা বলেন তখন শুধু চা-ই আসে, অন্য কিছু আসে না। অথচ প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। ভোর সাতটায় পরোটা-ভাজি খাওয়া হয়েছিল, এখন বারটা দশ। খিদেয় নাড়ি পাক দিয়ে উঠছে। মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে এতটা হৃদয়হীন হবে না। সঙ্গে কিছু-না-কিছু থাকবে। এদের ফ্রীজ খাবারদাবারে সবসময় ভর্তি থাকে। চট করে চমৎকার একটা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে দেয়া এদের কাছে ছেলেখেলা। দু'টি রুটির মাঝখানে কয়েক টুকরো পনির, শসার কুচি, এক চাকা টমেটো। ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং-এর আধচামচ। গোলমরিচের গুঁড়ো। চমৎকার!

কাজের মেয়েটি ট্রে নিয়ে ঢুকল। যা ভাবা গিয়েছে তাই। সুদৃশ্য কাপে চা এবং রুপোর একটা গ্লাসে এক গ্লাস হিমশীতল পানি। খিদে নষ্ট করার জন্যে ফিরোজ সিগারেট ধরাল। সেন্ট্রাল টেবিলে চমৎকার একটি অ্যাশট্রে। নিশ্চয়ই অনেক টাকা খরচ করে কেনা। একটি পরী নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরীটির গা থেকে কাপড় খুলে যাচ্ছে। সে কাপড় সামলাতে ব্যস্ত। অগোছালো কাপড়ের কারণে লজ্জায় তার গাল রক্তিম। এ-জাতীয় অ্যাশট্রেগুলিতে কেউ ছাই ফেলে না। এতটা দুঃসাহস কারো নেই। ফিরোজ ছাই দিয়ে সেটা মাখামাখি করে ফেলল। তার খুব ইচ্ছা করছে উঠে যাবার সময় এদের কোনো একটা ক্ষতি করতে। কার্পেটের খানিকটা সিগারেটের আগুনে পুড়িয়ে দেয়া, কাপটা ভেঙে ফেলা। এ-রকম ইচ্ছা তার প্রায়ই হয়।

ম্যানেজার নামক জীবটির এখনো কোনো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটি খবর দিয়েছে কি না কে জানে! নিজের ঘরে গিয়ে হয়তো গান শুনছে কিংবা ভিসিআর-এ 'আকালের সন্ধানে' চালু করে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের চিন্তায় মগ্ন।

ফিরোজ কাপ হাতে নিয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। ছাগল-দাড়ির এক লোক দু'টি অ্যালসেশিয়ানকে গোসল দিচ্ছে। সাবান দিয়ে হেভি ডলাডলি। কুকুর দু'টি বেশ আরাম পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। নড়াচড়া করছে না। লোকটি কুকুর দু'টির সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে। কাম কাম, সিট ডাউন, নটি বয়, বি কোয়ায়েট জাতীয় শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুকুররা বিদেশি ভাষা এত ভালো বোঝে কেন কে জানে! দেশি ঘিয়ে ভাজা কুত্তাকেও 'কাম হিয়ার' বললে কুঁই-কুঁই করে এগিয়ে আসে। ফিরোজের বাথরুম

পেয়ে গেল। কোনো বাড়িতে গিয়ে ফট করে বলা যায় না—ভাই, আপনাদের বাথরুম কোথায়? মালদার পার্টিদের ড্রইং রুমের পাশেই ব্যবস্থা থাকে। এখানে নেই। ড্রইং রুম নাম দিয়ে কুৎসিত একটা জিনিস বানিয়ে রেখেছে। ছাদ পর্যন্ত উঁচু শো-কেসে রাজ্যের জিনিস। যেন একটা মিউজিয়াম। পয়সার সঙ্গে-সঙ্গে রুচি বলে একটা বস্তু নাকি চলে আসে। ডাহা মিথ্যে কথা। এই জিনিসটি সঙ্গে নিয়ে জন্মাতে হয়।

একটা পাঁচ বাজে। ম্যানেজারবাবুর দেখা নেই। ফিরোজের উচিত স্লামালিকুম বলে উঠে যাওয়া। স্লামালিকুম বলারও কেউ নেই। অহঙ্কারী মেয়েটি এ-ঘরে আর ঢোকে নি। হয়তো ভেবেছে এ-ঘরে ঢুকলেই থার্ড রেট একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়ে যাবে। আরে বাবা, প্রেম এত সস্তা নয়! হুট করে হয় না। হুট করে প্রেম হয় কনজারভেটিভ ফ্যামিলিগুলিতে। ঐ সব ফ্যামিলির মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে মিশতে পারে না, হঠাৎ যদি সুযোগ ঘটে যায়—তাহলেই বড়শিতে আটকে গেল। উপরতলার মেয়েদের এই সমস্যা নেই। কত ধরনের ছেলের সঙ্গে মিশছে!

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। শো-কেসটির সামনে কিছুক্ষণ কাটানো যায়। ভদ্রলোক দেশ-বিদেশ ঘুরে এত সব জিনিস এনেছেন, কেউ এক জন দেখুক। এই বাড়িতে যারা বেড়াতে আসে তাদের শো-কেসও এ-রকম জিনিসে ভর্তি। এরা নিশ্চয়ই দেখার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ বোধ করে না। আর থাকা যায় না, চলে যাওয়া উচিত। ডেকোরেশনের ফার্মটা তার হলে এতক্ষণে চলেই যেত। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, ফার্মটা তার নয়। এক দিন যে এ-রকম একটা ফার্ম তার হবে, সে-রকম কোনো নমুনাও বোঝা যাচ্ছে না।

ম্যানেজার বাবু ঠিক দেড়টার সময় এলেন। ফিরোজ প্রথম যে-কথাটি বলল, তা হচ্ছে—বাথরুমটা কোথায়, আপনার কি জানা আছে?

অনেকক্ষণ থেকেই টেলিফোন বাজছে।

অপালা বারান্দায় ছিল, শুনতে পায় নি। ঘরের দিকে রওনা হওয়ামাত্র শুনল। টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে, আহা—না জনি কে! টেলিফোনের রিং হলেই অপালার কেন জানি মনে হয়, কেউ ব্যাকুল হয়ে ডাকছে। তার খুব একটা বড় সমস্যা। এই মুহূর্তেই তার কথা শোনা দরকার। এক বার সত্যি-সত্যি হলও তাই। রিসিভার তুলতেই ভারি মিষ্টি গলায় একটি মেয়ে বলল, 'সালাম ভাইকে কি একটু ডেকে দেবেন? আমার খুব বিপদ।'

অপালা বলল, 'সালাম ভাই কে?'

'আপনাদের একতলায় থাকে। প্লীজ, আপনার পায়ে পড়ি।'

'আমাদের একতলায় তো সালাম বলে কেউ থাকে না।'

'তাহলে এখন আমি কী করব?'

বলতে-বলতে সত্যি-সত্যি মেয়েটি কেঁদে ফেলল। অপালা নরম স্বরে বলল, 'আপনার রং নাম্বার হয়েছে, আবার করুন, পেয়ে যাবেন। আমি রিসিভার উঠিয়ে

রাখছি, তাহলে আর এই নাম্বারে চলে আসবে না।'

মেয়েটি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'নাম্বার ঠিক হলেও লাভ হবে না। ওরা ডেকে দেয় না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। শুধু যূথী বলে একটা মেয়ে আছে, ও ডেকে দেয়। কে জানে, আজ হয়তো যূথী নেই।'

'থাকতেও তো পারে, আপনি করে দেখুন।'

'আমাকে আপনি-আপনি করে বলছেন কেন? আমি মাত্র ক্লাস টেনে উঠেছি। আমাকে তুমি করে বলবেন।'

মেয়েটির সঙ্গে তুমি-তুমি করে কথা বলার আর সুযোগ হয় নি। তার টেলিফোন নাম্বার জানা নেই। মেয়েটিও অপালার নাম্বার জানে না। রং নাম্বারের একটি ব্যাপারে অল্প পরিচয়। কত দিন হয়ে গেল, এখনও সেই মিষ্টি গলার স্বর অপালার কানে লেগে আছে। টেলিফোন বেজে উঠলেই মনে হয়, ঐ মেয়েটি নয়তো?

না, ঐ মেয়ে না। সিঙ্গাপুর থেকে অপালার বাবা ফখরুদ্দিন টেলিফোন করেছেন।

'কেমন আছ মা?'

'খুব ভালো।'

'তোমার মা'র কোনো চিঠি পেয়েছ?'

'আজ সকালেই একটি পেয়েছি। মা এখন প্রায় সুস্থ।'

'সেকেণ্ড অপারেশনের ডেট পড়েছে?'

'সে-সব কিছু তো লেখেন নি।'

'এই মহিলা প্রয়োজনীয় কথাগুলি কখনো লেখে না। তুমি সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটার দিকে টেলিফোন করে জেনে নিও। এখানে সন্ধ্যা সাতটা মানে লণ্ডনে ভোর ছয়টা।'

'আচ্ছা, আমি করব।'

'খুব একা-একা লাগছে নাকি?'

'না, লাগছে না। তুমি আসছ কবে?'

'আরো দু'দিন দেরি হবে। কোনো খবর আছে?'

'না, কোনো খবর নেই।'

'বসার ঘরটা নতুন করে সাজাতে বলে গিয়েছিলাম। কিছু হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে। ভীষণ রোগা আর লম্বা একটা ছেলে রোজ এসে কী-সব যেন করছে। তার সাথে মিস্ত্রি-টিস্ত্রিও আছে।'

'কাজকর্ম কতদূর এগোচ্ছে?'

'তা তো জানি না বাবা! আমি নিচে বিশেষ যাই না।'

'একটু বলে দিও তো, যাতে আমি আসার আগে-আগে কমপ্লিট হয়ে থাকে।'

'আমি এক্ষুণি বলছি।'

'আর শোন, তোমার মাকে কিছু জানিও না। সে এসে সারপ্রাইজ্‌ড্ হবে।'

'আচ্ছা।'

'ঐ ছেলেটার নাম কি?'

'কোন ছেলেটার?'

'কাজ করছে যে।'

'নাম তো বাবা জানি না। জিজ্ঞেস করি নি। নাম দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'কোনো দরকার নেই। মতিন বলে একটা ছেলেকে দিতে বলেছিলাম। ওর কাজ ভালো। কিন্তু তুমি তো বলছ রোগা, লম্বা। ঐ ছেলে তো তেমন লম্বা নয়।'

'আমি নাম জিজ্ঞেস করব। যদি দেখি ও মতিন নয়, তাহলে কী করব?'

'কাজ বন্ধ রাখতে বলবে। আমি স্পেসিফিক্যালি বলেছি মতিনের কথা। তোমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে মা?'

'ভালো হচ্ছে না।'

'খুব বেশি খারাপ হচ্ছে?'

'কেমন যেন মাঝামাঝি হচ্ছে! মাঝামাঝি কোনো কিছুই আমার ভালো লাগে না।'

ফখরুদ্দিন সাহেব উঁচু গলায় হাসতে লাগলেন। অপালার এই কথায় হঠাৎ করে তিনি খুব মজা পেলেন।

'আচ্ছা মা, রাখলাম।'

'তুমি ভালো আছ তো বাবা?'

'অসম্ভব ভালো আছি। খোদা হাফেজ।'

অপালা নিচে নেমে এল। ঐ ভদ্রলোক বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছেন। তার সঙ্গের দু' জন লোক করাত দিয়ে কাঠ টুকরো করছে। অপালা বসার ঘরে উঁকি দিল। সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। পেইনটিংগুলি নামিয়ে রাখা হয়েছে, শো-কেসটি নেই। কার্পেট ভাঁজ করে এক কোণায় রাখা। অপালা বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

ফিরোজ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই। আপনার নাম কি মতিন?'

'আমার নাম মতিন হবে কী জন্যে? আমার নাম ফিরোজ।'

'আপনার নাম ফিরোজ হলে বড়ো রকমের সমস্যা—কাজ বন্ধ।'

'কাজ বন্ধ মানে?'

'কাজ বন্ধ মানে হচ্ছে আপনি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে বাড়ি চলে যাবেন।'

ফিরোজের মুখ হাঁ হয়ে গেল। যেন এমন অদ্ভুত কথা এর আগে সে শোনে নি। অপালা হেসে ফেলল। সে অবশ্যি হাসি মুহূর্তের মধ্যেই সামলে ফেলল। শান্ত গলায় বলল, 'বাবা টেলিফোনে বললেন, মতিন নামের একজনের নাকি কাজটা করার কথা।'

'কিন্তু আমি তো ঠিক তার মতোই করছি।'

'আপনি করলে হবে না।'

'মতিন এখন ছুটিতে আছে। তার বড়ো বোনের অসুখ। বরিশাল গেছে।'

'বরিশাল থেকে ফিরে এলে আবার না-হয় করবেন।'

ফিরোজ সিগারেট ধরাল। মেয়েটির কথা তার এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে ঠাট্টা করছে। যদি ঠাট্টা না হয়, তাহলে তার জন্যে বড়ো ধরনের ঝামেলা অপেক্ষা করছে। এই কাজটি সে জোর করে হাতে নিয়েছে। করিম সাহেবকে বলেছে, 'কোনো

অসুবিধা নেই, মতিনের চেয়ে কাজ খারাপ হবে না।' করিম সাহেব বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'আরে না। ভদ্রলোক মতিনের কথা বলেছেন।'

'আমি নিজে তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। সে বলেছে, আমি করলেও চলবে। কাজ ভালো হলেই চলবে।'

'দেখেন, পরে আবার ঝামেলা না হয়! বড়লোকের কারবার। মুডের উপর চলে। মাঝখানে যদি বন্ধ করে দেয়.....'

'পাগল হয়েছেন! কাজ দেখে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।'

এখন অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে ফিরোজেরই চোখ ট্যারা হয়ে যাবার যোগাড়। বি· করিম লোকটি মহা ত্যাঁদড়। হয়তো বলে বসবে, 'ফিরোজ সাহেব, এই ফার্মে আপনার কাজ ঠিক পোষাচ্ছে না। দু'দিন পর-পর ফার্মকে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলছেন। আপনি ভাই অন্য পথ দেখুন।'

করিম সাহেবের পক্ষে এটা বলা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক। ব্যাটা অনেকদিন থেকেই সুযোগ খুঁজছে। মাঝে-মাঝে ইশারা-ইঙ্গিতও করছে। গত সপ্তাহে বেতনের দিন বলল, 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে গেছে। কাজের চেয়ে মানুষ বেশি। বার হাত কাঁকুড়ের আঠার হাত বিচি।

ফিরোজ আধ-খাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে অপালার দিকে তাকাল। অপালা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ হাসি-হাসি। মনে হচ্ছে কায়দা করে এই মেয়েটিকে রাজি করিয়ে ফেলা যাবে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সী মেয়েদের মন তরল অবস্থায় থাকে। দুঃখ-কষ্টের কথা বললে সহজেই কাবু হয়ে যায়। মুশকিল হচ্ছে বলাটাই। এই বয়সী মেয়েদের সঙ্গে ভিখিরির গলার স্বরে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। তাতে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

'আমি বরং কাজটা শেষ করি। আমার ধারণা, আপনার বাবা যখন দেখবেন একটা চমৎকার কাজ হয়েছে... মানে চমৎকার যে হবে এই সম্পর্কে...'

অপালা হাসি মুখে বলল, 'না।'

ফিরোজ স্তম্ভিত। হাসিমুখে কাউকে না বলা যায়!

'এইভাবে আমি যদি চলে যাই তাহলে আমার নিজের খুব অসুবিধা হবে। চাকরিটা হয়তো থাকবে না। আপনি আপনার বাবাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন। আমার ধারণা, আপনার কথা উনি শুনবেন।'

'আপনার ধারণা ঠিক নয়।'

'এই বাজারে আমার চাকরি নিয়ে সমস্যা হলে কী যে অসুবিধায় পড়ব, আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না। আপনাদের বোঝার কথাও নয়। নিজ থেকে বলতে আমার খুবই লজ্জা লাগছে...'

অপালা মৃদু স্বরে বলল, 'যাবার আগে ঘরটা আগের মতো করে যাবেন। এ-রকম এলোমেলো ঘর দেখলে বাবা খুব রাগ করবেন।'

ফিরোজ দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। তার সঙ্গের লোক দু'টি চিন্তিত মুখে ফিরোজের দিকে তাকাচ্ছে। ফিরোজ নিচু গলায় বলল, 'যাও, ঘরটা গুছিয়ে ফেল।'

অপালা চলে যাচ্ছে। ফিরোজের গা জ্বালা করছে, মেয়েটি এক বার বলল না— সরি। মানবিক ব্যাপারগুলি কি উঠেই যাচ্ছে? গল্প-উপন্যাস হলে এই জায়গায়

মেয়েটির চোখে পানি এসে যেত। সে ধরা গলায় বলত—আমার কিছু করার নেই ফিরোজ ভাই। আমার বাবাকে তো আপনি চেনেন না—একটা অমানুষ!

ফিরোজ বলত, তুমি মন খারাপ করো না? তোমার মন খারাপ হলে আমারও মন খারাপ হয়। এই বলে সে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত।

কিন্তু জীবন গল্প-উপন্যাস নয়। জীবনে কুৎসিত সব ব্যাপারগুলি সহজভাবে ঘটে যায়। অপরূপ রূপবতী একটি মেয়ে হাসতে-হাসতে কঠিন-কঠিন কথা বলে।

'চা নিন।'

ফিরোজ দেখল, কাজের মেয়েটি ট্রেতে করে এক কাপ চা নিয়ে এসেছে। ফিরোজ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'চা কেন?'

'আপা দিতে বললেন।'

তার এক বার ইচ্ছা হল বলে—চা খাব না। কিন্তু এ-রকম বলার কোনো মানে হয় না। শীতের সকালবেলা এক কাপ চা মন্দ লাগবে না। সে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল। চা খাওয়া শেষ হলে আছাড় দিয়ে কাপটা ভেঙে ফেললেই হবে।

বি. করিম সাহেব বেশ কিছুক্ষণ মুখ ছুঁচালো করে রাখলেন।

চেঁচামেচি হৈচৈ কিছুই করলেন না। করলে ভালো হত। স্টীম বের হয়ে যেত। স্টীম বের হল না—এর ফল মারাত্মক হতে পারে। ফিরোজ ফলাফলের অপেক্ষা করছে। তার মুখ দার্শনিকের মতো। যা হবার হবে এই রকম একটা ভাব।

'ফিরোজ সাহেব।'

'জ্বি।'

'হাজার পাঁচেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেল, কি বলেন?'

'ক্ষতি হবে কেন? মতিন এইগুলি দিয়েই কাজ করবে।'

'পাগল, মতিন এই সব ছোঁবে? সে সবকিছু আবার নতুন করে করাবে।'

'তা অবশ্যি ঠিক।'

'বেকায়দা অবস্থা হয়ে গেল ফিরোজ সাহেব।'

'তা খানিকটা হল।'

'আপনাকে আগেই বলেছিলাম, যাবেন না। কথা শুনলেন না। রক্ত গরম, কারো কথা কানে নেন না।'

'রক্ত এক সময় গরম ছিল, এখন ঠাণ্ডা মেরে গেছে।'

'আমার যা সবচেয়ে খারাপ লাগছে তা হচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনি বলেছিলেন, ফখরুদ্দিন সাহেবের মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনার কথার উপর ভরসা করে.....'

করিম সাহেব বাক্য শেষ করলেন না। পেনসিল চাঁছতে শুরু করলেন। এটি খুব অশুভ লক্ষণ। পেনসিল চাঁছা শেষ হওয়ামাত্র বুলেটের মতো কিছু কঠিন বাক্য বের হবে। তার ফল সদূরপ্রসারী হতে পারে।

'ফিরোজ সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি বরং সিনেমা লাইনে চলে যান।'

'অভিনয় করার কথা বলছেন?'

'আরে না! অভিনয়ের কথা বলব কেন? সেট-টেট তৈরি করবেন। আপনি ক্রিয়েটিভ লোক, অল্প সময়েই নাম করবেন। জাতীয় পুরস্কার এক বার পেয়ে গেলে দেখবেন কাঁচা পয়সা আসছে।'

ফিরোজ মনে-মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কাঁচা পয়সা জিনিসটা কী, কে জানে? পয়সার কাঁচা-পাকা নেই। পয়সা হচ্ছে পয়সা।'

'ফিরোজ সাহেব।'

'জ্বি।'

'ঐ করুন।'

'সিনেমা লাইনে চলে যেতে বলছেন?'

'হ্যাঁ। আমরা বড়-বড় কাজটাজ পেলে আপনাকে ডাকব তো বটেই। আপনি হচ্ছেন খুবই ডিপেণ্ডেবল। এটা আমি সবসময় স্বীকার করি।'

'শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। আগে জানতাম না।'

'সিনেমা লাইনের লোকজন আপনাকে লুফে নেবে।'

'কেন বলুন তো?'

'সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, আপনার আর্ট কলেজের ডিগ্রি নেই। ডিগ্রিধারী কাউকে এরা নিতে চায় না। ওদের তেল বেশি থাকে। ডিরেক্টারের উপর মাতব্বরি করতে চায়। আপনি তা করবেন না।'

'ডিগ্রি না-থাকার তো বিরাট সুবিধা দেখছি! এই ফার্মের চাকরি কি আমার শেষ?'

করিম সাহেব কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর পেনসিল চাঁছা শেষ হয়েছে। তিনি সেই পেনসিলে কী যেন লিখতে শুরু করেছেন। ফিরোজ হাই তুলে বলল, 'আপনি কি আমাকে আরো কিছু বলবেন, না আমি উঠব?'

'আমার পরিচিত একজন ডিরেক্টর আছে। তার কাছে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠি নিয়ে দেখা করুন, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'আপনি তো দেখছি রীতিমতো মহাপুরুষ ব্যক্তি! চিঠিটা পেনসিলে না লিখে দয়া করে কলম দিয়ে লিখুন।'

'ইচ্ছা করেই পেনসিল দিয়ে লিখছি। পেনসিলের চিঠিতে একটা পারসোনাল টাচ থাকে, যে-জিনিসটা টাইপ- করা চিঠিতে বা কলমের লেখায় থাকে না।'

'গুড। এটা জানতাম না। এখন থেকে যাবতীয় প্রেমপত্র পেনসিলে লিখব।'

ডিরেক্টর সাহেবের বাসা কল্যাণপুর। সারা দুপুর খুঁজে সেই বাড়ি বার করতে হল। ডিরেক্টর সাহেবকে পাওয়া গেল না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বাড়িওয়ালার কাছে জানা গেল, ডিরেক্টর সাহেব ছ' মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি ফেলে চলে গেছেন। শুধু তাই নয়, যাবার সময় বাথরুমের দু'টি কমোড হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙেছেন।'

ফিরোজ চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কী!'

'ফিল্ম লাইনের লোক। বাড়ি-ভাড়া দেয়াই উচিত হয় নি। আপনি তার কে হন?'

'আমি কেউ হই না। আমিও এক জন পাওনাদার।'

'কত টাকা গেছে?'

'প্রায় হাজার দশেক।'

'ঐ টাকার আশা ছেড়ে দিন। ঐটা আর পাবেন? টাকা এবং স্ত্রী—এই দুই জিনিস হাতছাড়া হলে আর পাওয়া যায় না।'

ফিরোজ প্রায় বলেই বসছিল—আপনার স্ত্রীও কি তাঁর সাথে ভ্যানিশ হয়েছেন? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল। এখন রসিকতা করতে ইচ্ছ করছে না। সে ক্লান্ত স্বরে বলল, 'এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই পারি। আসুন, ভেতরে এসে বসুন। এত মন-খারাপ করবেন না। কী করবেন বলুন, দেশ ভরে গেছে জোচ্চোরে। আমার মতো পুরনো লোক মানুষ চিনতে পারে না, আর আপনি হচ্ছেন দুধের ছেলে!'

শুধু পানি নয়। পানির সঙ্গে সন্দেশ ও লুচি চলে এল। ভদ্রলোকের স্ত্রী পর্দার ও-পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছেন। দেখছেন। দেখছেন কৌতূহলী চোখে।

ভদ্রলোক ফুর্তির স্বরে বললেন, 'এই ছেলের কথাই তোমাকে বলছিলাম। একে ফতুর করে দিয়ে গেছে। কী-রকম অবস্থা একটু দেখ। হায়রে দুনিয়া!'

দশ মিনিটের ভেতর এই পরিবারটির সঙ্গে ফিরোজের চূড়ান্ত খাতির হয়ে গেল। ভদ্রলোক এক পর্যায়ে বললেন, 'দুপুরবেলা ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। হাত-মুখ ধুয়ে ভাত খেয়ে ফেল। বড়-বড় পাবদা মাছ আছে।'

ফিরোজের চোখ প্রায় ভিজে উঠল। এই জীবনে সে অনেকবারই অযাচিত ভালবাসা পেয়েছে। এই জাতীয় ভালবাসা মন খারাপ করিয়ে দেয়।

অপালার মা হেলেনা প্রথমে লণ্ডনের সেন্ট লিউক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর হার্টের একটি ড্যামেজড্ ভাল্ব এখানেই রিপেয়ার করা হয়। রিপেয়ারের কাজটি তেমন ভালো হয় নি। ডাক্তাররা এক মাস পর আর একটি অপারেশন করতে চাইলেন। তবে এও বললেন যে, অপারেশন নাও লাগতে পারে। তবে তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। এক মাস অবজারভেশনে রাখতেই হবে।

ফখরুদ্দিন সাহেব লণ্ডনের সাবার্বে লাল ইটের ছোটখাটো একটি নার্সিং হোম খুঁজে বের করলেন। এই হাসপাতালটি ঘরোয়া ধরনের। সবার প্রাণপণ চেষ্টা, যেন কিছুতেই হাসপাতাল মনে না হয়। কিছু অংশে তারা সফল। চট করে এটাকে হাসপাতাল মনে হয় না। তবে তার জন্যে রুগীদের প্রচুর টাকা দিতে হয়। এখানে বড় হাসপাতালের খরচের দেড়গুণ বেশি খরচ হয়। টাকাটাও আগেভাগেই দিয়ে দিতে হয়। ফখরুদ্দিন সাহেবের জন্যে সেটা কোনো সমস্যা হয় নি। টাকা খরচ করতে তাঁর ভালোই লাগে। ফখরুদ্দিন সাহেব নিজে যখন দরিদ্র ছিলেন, তখনো তাঁর এই স্বভাব

ছিল। পড়াশোনার খরচ দিতেন বড়মামা। তাঁর অবস্থা নড়বড়ে ছিল, তবু তিনি মাসের তিন তারিখে একটা মানিঅর্ডার পাঠাতেন। প্রায়ই এমন হয়েছে, মাসের ছ' তারিখেই সব শেষ। তখন ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। ফখরুদ্দিন সাহেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল একটিই—প্রচুর টাকা রোজগার করা, যাতে দু'হাতে খরচ করেও শেষ করা না যায়। ফখরুদ্দিন সাহেবের মেধা ছিল। ভাগ্যও প্রসন্ন ছিল। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ব্যবসা জমিয়ে ফেললেন। চারদিক থেকে টাকা আসতে শুরু করল। বিয়ে করলেন সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। বাসর রাতে স্ত্রীকে বললেন, 'টাকাপয়সা তোমার কাছে কেমন লাগে?'

হেলেনার বয়স তখন মাত্র সতের। আই· এ· পরীক্ষা দিয়ে বড় ফুপার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছে। সেখানেই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিয়ে। বাসর রাতে টাকা প্রসঙ্গে স্বামীর এই অদ্ভুত প্রশ্নের সে কোনো আগামাথা পেল না। সে চুপ করে রইল। ফখরুদ্দিন সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে—টু বিকাম রিচ। ভেরি রিচ। টাটা-বিড়লাদের মতো। তোমার কি ধারণা, আমি পারব?'

হেলেনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার কেন জানি মনে হতে লাগল,এই লোকটি ঠিক সুস্থ নয়। সুস্থ মানুষ বিয়ের প্রথম রাতে স্ত্রীকে নিশ্চয়ই এই জাতীয় কথা বলে না।

'বুঝলে হেলেনা, আমার মনে হয় আমি পারব। আমি খুব দ্রুত ভাবতে পারি। ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পাই। এটা একটা মেজর এ্যাডভানটেজ। অন্যারা যা আজ চিন্তা করে, আমি সেটা দু'বছর আগেই চিন্তা করে রেখেছি।'

হেলেনার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণ মাসে। হুট করে বিয়ে। আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, নিজের মা পর্যন্ত খবর জানেন না। টেলিগ্রাম করা হয়েছে, এখনো হয়তো পৌঁছে নি। ঘটনার আকস্মিকতা, বিয়ের উত্তেজনায় এমনিতেই হেলেনার মাথার ঠিক নেই, তার ওপর লোকটি ক্রমাগত কী-সব বলে যাচ্ছে!

'হেলেনা।'

'জ্বি।'

'আমি আজ কিঞ্চিৎ মদ্যপান করেছি, যেটা আমি কখনো করি না। আজ বাধ্য হয়ে নার্ভ স্টেডি রাখার জন্যে করতে হল। তুমি সম্ভবত গন্ধ পাচ্ছ।'

হেলেনা কোনো গন্ধটন্ধ পাচ্ছিল না। এখন পেতে শুরু করল। তার ইচ্ছে করল চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে।

'এই পৃথিবীতে আমি মোটামুটিভাবে একা। মানুষ করেছেন বড়মামা। তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে বিরাট একটা ঝগড়া হয়েছে। আজ তোমাকে বলব না, পরে বলব। আজ বরং আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি তোমাকে বলি।'

ঝুম-ঝুম করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। ফখরুদ্দিন সাহেব হাতে সিগারেট ধরিয়ে চক্রাকারে হাঁটছেন এবং কথা বলছেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় হেলেনার দম বন্ধ হবার যোগাড়। লোকটি একটির পর একটি সিগারেট ধরাচ্ছে। পুরোটা টানছে না, কয়েকটি টান দিয়েই ফেলে দিচ্ছে। হেলেনার ভয়-ভয় করতে লাগল। এ-কেমন ছেলে! কার সঙ্গে তার বিয়ে হল?

'এখনকার ট্রেণ্ডটা হচ্ছে কি, জান? চট করে ইণ্ডাসট্রি দিয়ে দেয়া। এতে সমাজে প্রেস্টিজ পাওয়া যায়। লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। কিন্তু এইসব

ইণ্ডাস্ট্রি শেষ পর্যন্ত হাতিপোষার মতো হয়। হাতির খাবার যোগাতে গিয়ে প্রাণান্ত। বুঝতে পারছ, কী বলছি?'

'না।'

'র মেটিরিঅ্যাল নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। ইণ্ডাস্ট্রির খাবার হচ্ছে র মেটিরিঅ্যাল, যার প্রায় সবই আনতে হয় বাইরে থেকে। আমি তা করব না। আমি যখন কোনো ইণ্ডাস্ট্রি দেব তার প্রতিটি র মেটিরিঅ্যাল তৈরি করব আমি নিজে।'

হেলেনা হাই তুলল। ফখরুদ্দিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?'

'না।'

'শুধু ব্যবসা নিয়ে কথা বলছি বলে কি বিরক্তি লাগছে?'

'না।'

'টাকা খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, বুঝলে হেলেনা। যে-সোসাইটির দিকে আমরা যাচ্ছি, সেই সোসাইটির ঈশ্বর হচ্ছে টাকা। একটা সময় আসবে, যখন তুমি টাকা দিয়ে সব কিনতে পারবে। সুখ, শান্তি, ভালবাসা—সব।'

হেলেনা দ্বিতীয় বার হাই তুলল। ফখরুদ্দিন সেই হাই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'খুব বেশি দূর তোমাকে যেতে হবে না। আজকের কথাই ধর। তোমার যদি প্রচুর টাকা থাকে, তাহলে তুমি সেই টাকায় বেহেশতে নিজের জন্যে একটা জায়গার ব্যবস্থা করতে পার।'

'কীভাবে?'

'টাকা খরচ করে হাসপাতাল দেবে, স্কুল-কলেজ দেবে, এতিমখানা বানাবে, লঙ্গরখানা বসাবে। এতে পুণ্য হবে। সেই পুণ্যের বলে বেহেশত। কাজেই টাকা দিয়ে তুমি পরকালের জন্যে ব্যবস্থা করে ফেললে, যে-ব্যবস্থ্য এক জন ভিখিরি করতে পারবে না। ইহকালে সে ভিক্ষা করেছে, পরকালেও সে নরকে পচবে—কারণ তার টাকা নেই। হা হা হা।'

তাঁর হাসি আর থামেই না। মাঝে-মাঝে একটু কমে, তার পরই আবার উদ্দাম গতিতে শুরু হয়। হেলেনা ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। বন্ধ দরজার পাশে বাড়ির মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের এক জন দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

ফখরুদ্দিন সাহেব হাসতে-হাসতেই বললেন, 'নাথিং। এ্যাবসলুটলি নাথিং। পানি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্রিং মি সাম ওয়াটার।'

হেলেনা হাসপাতালের বেডে শুয়ে পুরনো কথা ভাবেন।

স্মৃতি রোমন্থনের জন্যে নয়, সময় কাটানোর জন্যে। বইপত্র ম্যাগাজিন স্তূপ হয়ে আছে। বেশিক্ষণ এ-সব দেখতে ভালো লাগে না। টিভির অনুষ্ঠানও একনাগাড়ে দেখা যায় না। কথাবার্তা বোঝা যায় না। সবাই কেমন ধমক দেয়ার মতো করে ইংরেজি বলে। পুরোটাও বলে না। অর্ধেক গলার মধ্যে আটকে রাখে। যেন কথাগুলি নিয়ে গার্গল করছে।

'হেলেন।'

তিনি তাকালেন। সিস্টার মেরি এসে দাঁড়িয়েছে। এরা সবাই তাঁকে হেলেন ডাকে,

যদিও তিনি অনেক বার বলেছেন, তাঁর নাম হেলেনা—হেলেন নয়।

'তোমার একটি টেলিফোন এসেছে। কানেকশন এ-ঘরে দেয়া যাচ্ছে না। টেলিফোন সেটটায় গণ্ডগোল আছে। তুমি কি কষ্ট করে একটু আসবে?'

'নিশ্চয়ই আসব।'

তিনি বিছানা থেকে নামলেন। এই হাসপাতালে সিস্টার মেরিই একমাত্র ব্যক্তি, যার প্রতিটি কথা তিনি বুঝতে পারেন। এই মহিলার গলার স্বরও সুন্দর। শুনতে ইচ্ছে করে। সে কথাও বলে একটু টেনে-টেনে।

টেলিফোন ঢাকা থেকে এসেছে। অপালার গলা।

'মা, কেমন আছ?'

'ভালো।'

'আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করলে না তো?'

'কেমন আছিস?'

'ভালো। আমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে জিজ্ঞেস কর।'

'পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?'

'ভালো না। মাঝারি ধরনের।'

'বলিস কি! তুই এমন সিরিয়াস ছাত্রী, তোর পরীক্ষা মাঝারি ধরনের হবে কেন?'

'এখন হলে আমি কী করব?'

'তুই কি আমার কথা ভেবে-ভেবে পরীক্ষা খারাপ করলি?'

'হতে পারে। তবে কনশাসলি ভাবি না। অবচেতন মনে হয়তো ভাবি।'

'সেটা বুঝলি কীভাবে?'

'প্রায়ই স্বপ্নে দেখি, তোমার অপারেশন হচ্ছে। অপারেশনের মাঝখানে ডাক্তাররা গণ্ডগোল করে ফেলল..... এইসব আর কি।'

'সেকেণ্ড অপারেশনটা আমার বোধহয় লাগবে না।'

'তাই নাকি! এতবড় একটা খবর তুমি এতক্ষণে দিলে?'

'এখনো সিওর না। ডাক্তাররা আরো কী-সব টেস্ট করবে।'

'কবে নাগাদ সিওর হবে?'

'এই সপ্তাহটা লাগবে। তোর বাবা কেমন আছে?'

'জানি না। ভালোই আছে বোধহয়। একটা ভালো খবর দিতে পারি মা।'

'দিতে পারলে দে।'

'এখন থেকে ঠিক আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। বাবা সিঙ্গাপুর থেকে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছে।'

'ভালো।'

'তুমি মনে হচ্ছে তেমন খুশি হও নি।'

'খুশি হয়েছি।'

'গলার স্বর কিন্তু কেমন শুকনো-শুকনো লাগছে।'

'এই বয়সে কি আর খুশিতে নেচে ওঠা ঠিক হবে?'

'খুশি হবার কোনো বয়স নেই মা, যে-কোনো বয়সে খুশি হওয়া যায়।'

'তা যায়।'

'তুমি বাবার সঙ্গে চলে এসো।'

'যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে চলে আসব।'

'সব ঠিকঠাকই থাকবে।'

'থাকলেই ভালো।'

'মা, তোমার শরীর কি সত্যি-সত্যি সেরেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এমন করে কথা বলছ কেন? যেন কোনো উৎসাহ পাচ্ছ না। একটু হাস তো মা।'

তিনি হাসলেন। বেশ শব্দ করেই হাসলেন। আজ সারা দিনই তিনি খানিকটা বিষণ্ণ বোধ করছিলেন। সেই ভাবটা কেটে গেল। তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সুন্দর রোদ উঠেছে। আকাশ অসম্ভব পরিষ্কার। রোদে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে তাঁর ভালো লাগছে। বাতাস অবশ্যি খুব ঠাণ্ডা। সুচের মতো গায়ে বেঁধে। ভেতর থেকে ওভারকোটটি নিয়ে এলে ভালো হত। কিন্তু ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

চোখ মেলতেই প্রিয় দৃশ্যটি দেখা গেল।

জানালার কাছে চায়ের কাপ। একটি চড়ুই পাখি কাপের কিনারায় বসে ঠোঁট ডুবিয়ে চা খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে ফিরোজের দিকে। এই ব্যাপারটি প্রথম ঘটে ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখে। চায়ের দোকান থেকে যথারীতি জানালার পাশে গরম চা রেখে ডাক দিয়েছে—স্যার উঠেন। ফিরোজ ঘুম-ঘুম চোখে দেখেছে। হাত বাড়াতে-বাড়াতে আবার ঘুম। ঘুম ভাঙল এগারটার দিকে কিচিরমিচির শব্দে। চায়ের কাপ ঘিরে পাঁচ-ছ'টা চড়ুই পাখি। মহানন্দে কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে কিচিরমিচির করছে। সেই থেকে রোজ হচ্ছে। পাখিগুলি মনে হয় অপেক্ষা করে থাকে কখন চা আসবে। সেই চা ঠাণ্ডা হবে। রোজ তাদের সে-সুযোগ হয় না। বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফিরোজ কাপ টেনে নেয়। চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত। তিক্ত, কষা ও মধু—এই তিন স্বাদের সমাহার। ভোরের প্রথম শারীরিক আনন্দ।

আজ ফিরোজের কোনোই কাজ নেই। কোথাও যেতে হবে না। দেনদরবার করতে হবে না। সাধারণত যে-দিন কোনো কাজ থাকে না, সে-দিন সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভেঙে যায়। কাজের দিনে কিছুতেই ঘুম ভাঙতে চায় না। মনে হয় আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকি। আজ উল্টো ব্যাপার ঘটল। কোনো কাজকর্ম নেই, তবু বেশ খানিকক্ষণ ঘুমুনো গেল। চড়ুই পাখিটি কৃতজ্ঞ চোখে তাকাচ্ছে।

তার সঙ্গীরা আজ কেউ আসে নি। এলেও চা-পর্ব সমাধা করে চলে গিয়েছে। এই ব্যাটা যাচ্ছে না। হিন্দি ভাষায় ফিরোজ পাখিটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাল। পশু-পাখিরা বাংলা ভাষাটা তেমন বোঝে না।

'কেয়া ভাই চিড়িয়া, হালত কেয়া?'

'চিকির চিকির চিক।'

'চিনি উনি সব ঠিক থা?'

'চিকির চিকির।'

'আউর এক দফা হোগা কেয়া নেহি?'

'চিক চিকির চিকির।'

ফিরোজের ধারণা, পাখিরা মোর্স কোডে কথা বলে। চিকির এবং চিক এই দু'টি শব্দই নানান পারমুটেশন কম্বিনেশনে বেরিয়ে আসছে। এই বিষয়ে একটা গবেষণা হওয়া উচিত। সময় থাকলে দু'-একজন পক্ষীবিশারদের সাথে কথা বলা যেত। পশু-পাখিদের ভাষাটা জানা থাকলে নিঃসঙ্গ মানুষদের বড় সুবিধে হত।

ফিরোজ টুথপেস্ট হাতে বারান্দায় এল। তার ঘর দোতলায়। একটি শোবার ঘর। জানালাবিহীন অন্য একটি কামরা এক শ' ওয়াটের বাতি জ্বাললেও অন্ধকার হয়ে থাকে। সেই ঘরের উল্টো দিকে বাথরুম, যা অন্য এক জন ভাড়াটে রমিজ সাহেবের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যখনি ফিরোজের বাথরুমে যাবার দরকার হয়, তখনি রমিজ সাহেবকে বাথরুমের ভেতর পাওয়া যায়। ভদ্রলোকের ব্যাপার সব অদ্ভুত। বাথরুমে এক বার ঢুকলে আর বেরুবেন না। ফিরোজের ধারণা, বসে থাকতে-থাকতে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েন।

'এই যে ব্রাদার, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।'

রমিজ সাহেব খুক-খুক করে দু' বার কাশলেন।

'আজ অফিসে যান নি? এগারটা বাজে, এখনো বাথরুমে বসে আছেন?'

আবার খুক-খুক কাশি। নাক ঝাড়ার শব্দ।

'বেরিয়ে আসুন ভাই। খানিকক্ষণ পর না-হয় নতুন উদ্যমে আবার যাবেন। বাথরুম তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

রমিজ সাহেব ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়ে বের হয়ে এলেন। কড়া গলায় বললেন, 'রোজ-রোজ এইসব কী বাজে কথা বলেন?'

'বাজে কথা কি বললাম?'

'এইসব আমি পছন্দ করি না। খুবই অ-পছন্দ করি। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেন কেন? এইটা কী-ধরনের ভদ্রতা?'

'আজ কিন্তু ধাক্কা দিই নি।'

'অভদ্র ছোকরা।'

রমিজ সাহেব রাগে গর-গর করতে-করতে নিজের ঘরে গেলেন। ভদ্রলোক সম্ভবত অসুস্থ। গলায় মোটা মাফলার। চোখমুখ ফোলা-ফোলা। অফিসেও যান নি। ফিরোজ কিঞ্চিৎ লজ্জিত বোধ করল। এক জন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে রসিকতা করা ঠিক হচ্ছে না। রসিকতার প্রচুর বিষয় আছে।

বেরুতে-বেরুতে সাড়ে বারটা বেজে গেল। একতলার বারান্দায় বাড়িওয়ালা বসে আছেন। আজ তাঁকে দেখে চট করে সরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দু' মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি ছিল। গত সপ্তাহেই সেটা দিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাড়িওয়ালার ছোট মেয়েটির জন্যে সে এক জন পাত্রের খোঁজে আছে, এমনও বলেছে। এটা বলার দরকার ছিল। কারণ বাড়িওয়ালা হাজি আসমত আলি ওপরের দু' জন ভাড়াটেকে উৎখাত করতে চাইছেন। সেখানে নাকি তাঁর বড় জামাই আসবেন। বড় জামাইয়ের

চাকরি নেই। বাড়ি-ভাড়া দিয়ে থাকতে পারছেন না। চাকরিবাকরির কোনো ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবেন।

ফিরোজ আঁতকে উঠে বলেছে, 'খাল কেটে লোকজন কুমির আনে, আপনি তো হাঙর আনার ব্যবস্থা করছেন! জামাই এক বার ঢুকলে উপায় আছে?'

হাজি আসমত আলি বলেছেন, 'করব কী তাহলে, ফেলে দেব?'

'অফকোর্স ফেলে দেবেন। জামাই, শালা এবং ভাগ্নে—এই তিন জিনিসকে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না যদি বাঁচতে চান।'

'আপনি সবসময় বড় আজেবাজে কথা বলেন।'

'কোন কথাটা আজেবাজে বললাম?"

'এই নিয়ে আপনার সঙ্গে বক-বক করতে চাই না। আপনি ভাই ডিসেম্বর মাসের ত্রিশ তারিখে বাড়ি ছেড়ে দেবেন। এক মাসের নোটিশ দেবার কথা—দিলাম।'

'আচ্ছা, ছেড়ে দেব। উনত্রিশ তারিখেই ছেড়ে দেব। এক দিন আগে।'

মেয়ে বিয়ের প্রসঙ্গ এর পরপরই ফিরোজকে আনতে হয়েছে। কাল্পনিক এক পাত্র দাঁড় করাতে হয়েছে। এই ব্যাপারে হাজি সাহেব যে-আগ্রহ দেখাবেন বলে আশা করা গিয়েছিল, তার চেয়েও বেশি দেখালেন। ফিরোজ যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'ছেলে এম· এ· পাশ করেছে গত বছর। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার কথা ছিল, পায় নি। সেকেণ্ড ক্লাস ফোর্থ হয়েছে। একটা পেপার খুবই খারাপ করেছে। দেখতে রাজপুত্র নয়, সেটা আগেই বলে দিচ্ছি। চেহারা মোটামুটি, তবে ভালো ফ্যামিলির ছেলে। ঢাকায় নিজের বাড়ি। পুরনো ধরনের বাড়ি। তবে ময়মনসিংহ শহরে বিরাট বাড়ি। চার বোন তিন ভাই। ছোট বোনের বিয়ে হয় নি। ভাইরা সবাই স্ট্যাব্লিশড।

'ছেলে করে কী?'

'এখনো কিছু করে না। মাত্র তো পাস করল। তবে পারিবারিক অবস্থা যা, কিছু না-করলেও হেসে-খেলে দু'-তিন পুরুষ কেটে যাবে।'

'ওদের সঙ্গে আপনার পরিচয় কীভাবে?'

'আমার আপন ফুপাতো ভাই। আপনি আপনার মেয়ের একটি ছবি দিয়ে দেবেন, বাকি যা করার আমি করব। আরো ছেলে আছে আমার হাতে, নো প্রবলেম। ভালো কথা, ব্ল্যাক এ্যাণ্ড হোয়াইট এবং কালার—দু' ধরনের ছবিই দেবেন।'

'আচ্ছা দেব। ছবি দেব। যদি মেয়ে দেখতে চান, কোনো অসুবিধা নাই, যেখানে বলবেন। কালার ছবি ঘরে নাই, স্টুডিওতে তুলতে হবে।'

'তুলে ফেলুন। কালারের যুগ এখন।'

বিয়ের ঐ আলাপ-আলোচনার পর বাড়ি ছাড়ার প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। দু' মাসের ভাড়াও হাজি সাহেব চাওয়া বন্ধ করলেন। অবশ্যি ভাড়া দিয়ে দেয়া হয়েছে, তবু মনে সন্দেহ, আবার বাড়ি ছাড়ার প্রসঙ্গ ওঠে কি না।'

হাজি সাহেব ফিরোজকে বেরুতে দেখেও কিছু বললেন না। বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে রইলেন। ফিরোজ এগিয়ে এল, 'রোদ পোহাচ্ছেন?'

'জ্বি।'

'খুব ভালো, শরীরে ভিটামিন সি প্রডিউস হচ্ছে।'

'ঐ ছেলের ব্যাপারে তো আর কোনো খবর দিলেন না।'

'ছবি? ছবি চাচ্ছে তো!'

'ছবি তো তুলে রেখেছি। চান না, তাই.....'

'কী মুশকিল, চাইব না কেন! যান, নিয়ে আসুন। আজ ছেলের বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে। দেখা যে হবেই তা বলছি না—একটা প্রবাবিলিটি।'

ছবি দেখে ফিরোজের মন উদাস হয়ে গেল। ভারি মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে। চোখ ছল-ছল করছে। হাজি সাহেবের মেয়েগুলি বোরকা পরে। ফিরোজ কখনো এদের মুখ দেখে নি। ভাগ্যিস দেখে নি। দেখলেই এই বোরকাওয়ালির প্রেমে পড়ে যেতে হত।

'আপনার মেয়ে তো খুবই রূপবতী।'

হাজি সাহেব কিছুই বললেন না। ফিরোজ বলল, 'এই রকম একটা মেয়ের বিয়ে নিয়ে কেউ চিন্তা করে? আশ্চর্য!'

হাজি সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'অন্য সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

'ওর পায়ে একটু দোষ আছে।'

'কী দোষ?'

'পোলিও হয়েছিল।'

'বলেন কী!'

'হাঁটা-চলায় কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু।'

ফিরোজের অসম্ভব মন খারাপ হয়ে গেল। তার প্রচণ্ড ইচ্ছে হতে লাগল বলে ফেলে-আমি এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। শেষ পর্যন্ত বলল না। তার আবেগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

'আমি টাকাপয়সা যথেষ্ট খরচ করব। এই মেয়েটা আমার খুব আদরের। যদি একটা ভালো ছেলে দিতে পারেন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ফিরোজ লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল। যদিও তার খুব মন-খারাপ ছিল, রাস্তায় নেমে মন ভালো হয়ে গেল। কী সুন্দর ঝকঝকে রোদ! ঘন নীল আকাশ। বাতাস কত মধুর! বেঁচে থাকার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে?

ফিরোজ হাঁটছে ফুর্তির ভঙ্গিতে। কোনো কাজকর্ম নেই, চিন্তা করতেই ভালো লাগছে। যদিও উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। তার ফুর্তির মূল কারণ হচ্ছে পকেট একেবারে ফাঁকা নয়। আট শ' ত্রিশ টাকা আছে। এতগুলো টাকা পকেটে নিয়ে শুধু-শুধু দুশ্চিন্তা করার কোনো মানে হয় না। দুশ্চিন্তা মানেই পেপটিক আলসার, ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা। তারচেয়ে হাসিমুখে ঢাকার রাস্তায় হাঁটা অনেক ভালো।

ঢাকার রাস্তাগুলি এখন বেশ সুন্দর। হেঁটে বেড়ানোর জন্যে এবং ভিক্ষা করবার জন্যে আদর্শ। ফুটপাতে ভিক্ষুকরা কী সুন্দর ঘর-সংসার সাজিয়ে ভিক্ষা করছে!

ফিরোজ এই মুহূর্তে কৌতূহলী হয়ে একটি ভিক্ষুক-পরিবারকে দেখছে। এক বুড়ো তার দু' পাশে দু'টি ছোট-ছোট বাচ্চাকে নিয়ে ভিক্ষা করছে। তাদের একটু পিছনেই ইটের চুলায় রান্না হচ্ছে। ঘোমটা-দেয়া গৃহস্থ প্যাটার্নের একটি মেয়ে মাটির

হাঁড়িতে চাল দিচ্ছে। এই পরিবারটির চোখে-মুখে দুঃখ-বেদনার কোনো ছাপ নেই। বরং বুড়োর মুখে একটা প্রশান্তির ভাব আছে। বাচ্চা দু'টি একটু পর-পর দাঁত বের করে হাসছে। ফিরোজ কী মনে করে একটা চকচকে পাঁচ টাকার নোট বুড়োর থালায় ফেলে দিল। ভিখিরিরা এই জাতীয় ঘটনায় আবেগে উদ্বেলিত হয়। এই বুড়ো নিস্পৃহ ভঙ্গিতে নোটটা নিজের বুক-পকেটে রেখে দিল। খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। থালায় একটি নোট থাকলে পয়সাকড়ি পড়বে না। ফিরোজের আফসোসের সীমা রইল না। টাকাটা জলে গেল। দাতা সাজবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অদূর ভবিষ্যতে তাকে যদি এ-রকম টিনের থালা নিয়ে বসতে হয় এবং কেউ যদি একটা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দেয়, তাহলে সে আনন্দের এমন প্রকাশ দেখাবে যে চারদিকে লোক জমে যাবে। দর্শকদের আনন্দের জন্যে সে বাঁদর-লাফ দিতেও রাজি আছে।

বাচ্চা দু'টির মধ্যে কী-কারণে যেন মারামারি লেগে গেছে। দু' জনই এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারছে। এক জন মনে হচ্ছে খামচিবিশারদ। একেক বার খামচি দিয়ে ছাল-চামড়া নিয়ে আসছে। জমাট দৃশ্য। কিন্তু বুড়োর এই দৃশ্যেও কোনো ভাবান্তর হচ্ছে না। সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ততা নিয়ে সে বসে আছে, রন্ধনরতা ঘোমটা-দেয়া মেয়েটিও কিছু বলছে না।

ফিরোজের ইচ্ছে করছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে এই পরিবারটিকে দেখে-দেখে দুপুরটা কাটিয়ে দেয়। সেটা করা ঠিক হবে না। লোকে অন্য অর্থ করবে। যে-মেয়েটি রাঁধছে তার বয়স অল্প। মুখে লাবণ্য এখনো খানিকটা আছে। এই মেয়ের আশেপাশে দীর্ঘ সময় থাকার একটি মানেই হয়। বুড়ো যে পাঁচটি টাকা পেয়েও বিরস মুখে বসে রইল তার মানেও এই। বুড়ো অন্য কিছু ভেবে বসেছে। ফিরোজ মগবাজারের দিকে লম্বা-লম্বা পা ফেলতে লাগল। এখন সে যাবে তাজিনদের বাসায়। তাজিন তার বড় বোন। মগবাজার ওয়ারলেস কলোনিতে থাকে। ফিরোজের যখন টাকাপয়সার টানাটানি হয় তখন দুপুরে এই বাড়িতে খেতে আসে।

'কেমন আছিস রে আপা? তোর পুত্র-কন্যারা কোথায়? বাসা একেবারে খালি মনে হচ্ছে!'

তাজিন মুখ অন্ধকার করে রাখল।

'হয়েছে কী? কথা বলছিস না কেন? কর্তার সঙ্গে আবার ফাইটিং?'

তাজিন থমথমে গলায় বলল, 'তুই কি একটা মানুষ, না অন্য কিছু?'

'কেন?'

'রুমি এত করে বলে দিল তার জন্মদিনে আসার জন্যে, তুই আসতে পারলি না? মেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে অস্থির। বাচ্চাগুলি তোকে এত পছন্দ করে, আর তুই এ-রকম করিস? ভালবাসার দাম দিতে হয় না?'

'খুব কেঁদেছিল?'

'জিনিসপত্র ফেলে-ছড়িয়ে একাকার করেছে, শেষে তোর দুলাভাইকে পাঠালাম তোর খোঁজে।'

'আপা, হয়েছে কি জান..... আমাদের এক কলিগ.....'

'চুপ কর, আর মিথ্যা কথা বলতে হবে না। ভাত খেতে এসেছিস, খেয়ে বিদায় হ।'

'আজ তোদের রান্না কী?'

তাজিন জবাব না-দিয়ে টেবিলে ভাত বাড়তে লাগল।

'তোদের টেলিফোন ঠিক আছে আপা?'

'আছে।'

'তুই রেডি কর সবকিছু, আমি টেলিফোন করে আসছি। দারুণ একটা খবর আছে। আগামী সপ্তাহে বিয়ে করছি।'

এই দারুণ খবরেও তাজিনকে বিচলিত মনে হল না।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? এই নে, মেয়ের ছবি দেখ। কি, এখন বিশ্বাস হচ্ছে?'

ফিরোজ টেলিফোন করতে গেল। বি· করিম সাহেবকে জিজ্ঞেস করবে, মতিন কাজটা করেছে কি না। বি· করিম সাহেবকে পাওয়া গেল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'কে, ফিরোজ সাহেব নাকি?'

'আমার কি সৌভাগ্য। গলা চিনে ফেলেছেন!'

'ঠাট্টা করছেন নাকি ভাই?'

'পাগল হয়েছেন! আপনার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক?'

'আমার চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। বহু কষ্টে ব্যাটার ঠিকানা বের করতে হয়েছে।'

'কী বলেছেন উনি?'

'আপনার পারসোনাল টাচওয়ালা পেনসিলের চিঠিটা পড়ে মুখ বিকৃত করে বলল, বি. করিম—এই শালা আবার কে? আমার কাছে পেনসিলে চিঠি লেখে, আস্পর্ধা তো কম নয়!'

করিম সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে মেঘস্বরে বললেন, 'ফিরোজ সাহেব, একটা কথা শুনুন।'

'বলুন।'

'কেন সবসময় এ-রকম উল্টোপাল্টা কথা বলেন?'

'সত্যি কথা বলছি। শুধু-শুধু মিথ্যা বলব কেন?'

'ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আপনি তাঁর কাছে এখনো যান নি। তিনি ঠিকানা বদলেছেন, এখন থাকেন রামকৃষ্ণ মিশন রোডে।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি গেলেই উনি আপনাকে কাজ দেবেন।'

'মেনি থ্যাংকস।'

'ফিরোজ সাহেব।'

'জ্বি।'

'আচার-আচরণ সাধারণ মানুষের মতো করার চেষ্টা করুন। ইয়ারকি- ফাজলামি তো যথেষ্ট করলেন। বয়স কত আপনার?'

'পঁয়ত্রিশ।'

'বয়স তো মাশাআল্লাহ্ কম হয় নি। আরেকটা কথা।'

'বলুন, শুনছি।'

'ফখরুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে একবার যাবেন।'

'কেন?'

'ওনার মেয়ে টেলিফোনে আপনাকে চাচ্ছিল।'

'বলেন কী! কী-রকম গলায় চাইল?'

'কী-রকম গলায় মানে!'

'প্রেম-প্রেম গলা, না রাগ-রাগ গলা?'

বি· করিম সাহেব তার উত্তর দিলেন না। টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। রাগে তাঁর গা জ্বলে যাচ্ছে। ফিরোজ হৃষ্টচিত্তে খেতে বসল। প্রচুর আয়োজন। টেবিলের দিকে তাকাতেই মন ভরে যায়।

'সিরিয়াস এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেছে, বুঝলে আপা। একেবারে লদকালদকি প্রেম।'

তাজিন কিছু বলল না। একটা বিশাল আকৃতির সরপুঁটি ভাজা ফিরোজের পাতে তুলে দিল।

'ঐ মেয়ে আমার খোঁজে দিনে চার বার পাঁচ বার করে অফিসে টেলিফোন করছে। বি· করিম সাহেবের কান ঝালাপালা।'

'সত্যি-সত্যি বলছিস?'

'এই যে মাছ হাতে নিয়ে বলছি। বাঙালির ছেলে মাছ হাতে মিথ্যা কথা বলে না।'

'মেয়েটার নাম কি?'

'অপালা। বিয়ের পর অপা করে ডাকব। অপালা শব্দটার মানে কী, জানিস নাকি?'

'জানি না। মেয়েটাকে ছবিতে যে-রকম দেখাচ্ছে আসলেও কি সে-রকম সুন্দর?'

ফিরোজ ভাত মাখতে-মাখতে বলল, 'তুই একটা মিসটেক করে ফেললি রে আপা। ছবির মেয়ে আর ঐ মেয়ে দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। তুই গুবলেট করে ফেলেছিস।'

তাজিন রাগ করতে গিয়েও করতে পারল না। তাদের পাঁচ বোনের পর এই এক ভাই। আদরে-আদরেই ওর মাথা নষ্ট হয়েছে। জীবনে কিছুই করল না। কোনো দিন যে করতে পারবে তাও মনে হচ্ছে না।

'ফিরোজ।'

'বল্।'

'সবটাই কি তোর কাছে একটা খেলা?'

'খেলা হবে কেন?'

তাজিন আর কিছু বলল না। ফিরোজের খাওয়া দেখতে লাগল। কেমন মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে খাচ্ছে। গালভর্তি দাড়ি। হঠাৎ দাড়ি রাখার শখ হল কি জন্যে কে বলবে? জিজ্ঞেস করলে অদ্ভুত কিছু বলে হাসাতে চেষ্টা করবে। ইদানীং আর ফিরোজের কথায় তার হাসি আসে না, রাগ ধরে যায়। চড় মারতে ইচ্ছে করে।

'দাড়িতে আমাকে কেমন লাগছে রে আপা?'

'ভালো।'

'রবীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ভাব চলে এসেছে না?'

তাজিন কিছু বলল না।

'রবীন্দ্রনাথের মুখের গঠনের সাথে আমার মুখের গঠনের অদ্ভুত মিল আছে।

চুলদাড়িগুলি আরেকটু লম্বা হোক, দেখবি।'

'তখন কী করবি? একটা আলখাল্লা কিনবি?'

'এটা মন্দ বলিস নি আপা। একটা আলখাল্লা কিনলে হয়। রেডিমেড বোধহয় পাওয়া যায় না। অর্ডার দিয়ে বানাতে হবে। তারপর সেই আলখাল্লা পরে বাংলা একাডেমীর কোনো একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে সবাইকে ভড়কে দেব। চারদিকে ফিসফাস শুরু হবে—গুরুদেব এসে গেছেন।'

'চুপ কর্ দেখি!'

'সরি, আমার আবার মনেই থাকে না তুই বাংলার ছাত্রী। দে, একটা পান দে। চমনবাহার থাকলে চমনবাহার দিয়ে দে।'

অপালা যে-বার ক্লাস এইটে বৃত্তি পেল, সে-বার তার বাবা তাকে চমৎকার একটা উপহার দিয়েছিলেন। লিসবন থেকে কেনা মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই-করা পাঁচ শ' পাতার বিশাল একটা খাতা। মলাটে একটি স্প্যানিস নর্তকীর ছবি। চামড়ায় এত সুন্দর ছবি কী করে আঁকা হল কে জানে! দেখলে মনে হয় মেয়েটি চামড়া ফুঁড়ে বের হয়ে এসে নাচা শুরু করবে।

ভেতরের পাতাগুলির রঙ মাখনের মতো। কী মসৃণ! প্রতিটি পাতায় অপূর্ব সব জলছাপ। গাছপালা, নদী, আকাশের মেঘ।

ফখরুদ্দিন সাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, 'উপহারটি মনে হয় খুব পছন্দ হয়েছে?'

আনন্দে অপালার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। সে নিজেকে সামলে গাঢ় গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

'এখন থেকে এই খাতায় গল্প, কবিতা, নাটক—এইসব লিখবে।'

'এইসব তো আমি লিখতে পারি না বাবা।'

'লিখতে-লিখতেই লেখা হয়। চেষ্টা করবে। ঐ সব না পার, জীবনের বিশেষ-বিশেষ ঘটনা লিখে রাখবে। এই যে তুমি বৃত্তি পেলে, এটা তো বেশ একটা বড় ঘটনা। সুন্দর করে এটা লিখবে। তারপর তোমার যখন অনেক বয়স হয়ে যাবে, চুল হবে সাদা, চোখে ছানি পড়বে—তখন ঐ খাতাটা বের করে পড়বে, দেখবে কত ভালো লাগে।'

'আমি কোনোদিন বুড়ো হব না বাবা।'

'তাই বুঝি?'

ফখরুদ্দিন সাহেব ঘর কাঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন।

চমৎকার সেই খাতায় প্রথম এক বছর অপালা কিছুই লিখল না। তার অনেক বার লিখতে ইচ্ছে করল, কলম নিয়ে বসল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুন্দর পাতাগুলি নষ্ট করতে ইচ্ছে করল না। সে খাতা খুলে রেখে মনে-মনে পাতার পর পাতা লিখে যেতে লাগল। অনেক লেখা পছন্দ হল না, সেগুলি মনে-মনেই কেটে নতুন করে লিখল।

ক্লাস নাইনে হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার শেষ দিনে সে প্রথম বারের মতো লিখল। সাধু ভাষায় লেখা সেই অংশটিই এই—

"আজ আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমার মনে কোনো আনন্দ হইতেছে না। পরীক্ষা বেশ ভালো হইয়াছে। তবে কেন আমার আনন্দ হইতেছে না? আমি সঠিক জানি না। মাঝে-মাঝে খুব আনন্দের সময় আমার দুঃখ লাগে। আমি কাঁদিয়া ফেলি। গত বছর আমরা নেপালের 'পোখরা' নামক একটি স্থানে গিয়াছিলাম। চারিদিকে বিশাল পাহাড়। কত সুন্দর দৃশ্য! বাবা এবং মা'র মনে কত আনন্দ হইল। বাবা ক্যামেরা দিয়া একের পর এক ছবি তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই আমার মনে খুব দুঃখ হইল। গলা ভার-ভার হইল। চোখ দিয়া পানি আসিতে লাগিল। ভাগ্যিস কেহ দেখিতে পায় নাই।"

অপালার খাতাটি ক্রমে ভরে উঠতে লাগল। ক্লাস টেনে উঠে প্রথম গল্প লিখল। বয়সের সঙ্গে তার গল্পটি মিশ খায় না। গল্পের নাম রাজ-নর্তকী। গল্পের বিষয়বস্তু পনের বছরের মেয়ের কলমে ঠিক আসার কথা নয়। শুরুটা এ-রকম ঃ

## রাজ-নর্তকী

মহিমগড়ের রাজপ্রাসাদে থাকে এক নর্তকী। রাজসভাতে গান করে, নাচে। তার নাচ যে-ই দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়। সেই রাজসভায় এক দিন এলেন ভিনদেশি এক কবি। তিনি নর্তকীর নাচ দেখে মুগ্ধ হলেন। হাত জোড় করে বললেন, 'দেবী, আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?'

নর্তকী হাসিমুখে বলল, 'আমার নাম অপালা।'

'দেবী, আমি কি নিভৃতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

হ্যাঁ, পারেন। আসুন গোলাপ-বাগানে।'

তারা দু' জন গোলাপ-বাগানে গেল। ফুলে-ফুলে চারদিক আলো হয়ে আছে। রাজ-নর্তকী অপালা বলল, 'কী আপনার নিবেদন, কবি? আপনি আমার কাছে কী চান?'

'যা চাই তাই কি আমি পাব? এত বড় সৌভাগ্য সত্যিই কি আমার আছে?'

তা তো বলতে পারছি না। আগে আমাকে বলতে হবে, আপনি কী চান?'

'আমি আপনাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখতে চাই।'

'বেশ তো, লিখুন।'

'আপনার অপূর্ব দেহ-সুষমা নিয়ে একটি কবিতা লিখতে চাই।'

'বেশ তো।'

'কিন্তু দেবী, তার জন্যে আপনার দেহটিকে তো আমার দেখতে হবে।'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন। পাচ্ছেন না?'

'না, পাচ্ছি না। আপনার অপূর্ব দেহটি আড়াল করে রেখেছে কিছু অপ্রয়োজীয়-পোশাক। এইগুলি খুলে ফেলুন। পোশাক আপনার জন্যে বাহুল্য। এত সুন্দর একটি শরীরকে পোশাক ঢেকে রাখবে এটা কিছুতেই আমি মেনে নিতে পারি না।'

সে খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর একে-একে খুলে ফেলল সব। শুধু গলায় রইল একটি চন্দ্রহার। সে চন্দ্রহারও খুলে ফেলতে গেল। কিন্তু কবি চেঁচিয়ে উঠলেন, না না, চন্দ্রহার খোলার দরকার নেই। চন্দ্রহার সরিয়ে ফেললে দেহের সমস্ত সৌন্দর্য একসঙ্গে আমার চোখে এসে পড়বে। আমি তা সহ্য করতে পারব না।

গলায় শুধুমাত্র চন্দ্রহার পরে সে বাগানে হাঁটতে লাগল। আর রাজকবি একটি গাছের ছায়ায় তাঁর কবিতার খাতা নিয়ে বসলেন। আকাশ ঘন নীল। সূর্য তার হলুদ ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে চারদিকে। বাতাসে সেই হলুদ ফুলের নেশা-ধরানো গন্ধ। গাছে-গাছে পাখি ডাকছে।

গল্পের শেষ অংশ বেশ নাটকীয়। হঠাৎ বাগানে প্রবেশ করলেন রাজা। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রাজ-নর্তকী অপালার মৃত্যুদণ্ড হল । কবির চোখ অন্ধ করে দেয়া হল। অন্ধ কবি পথে-পথে ঘুরে বেড়ান এবং নর্তকীকে নিয়ে গীত রচনা করেন। অপূর্ব সব গীত। তিনি নিজেই তাতে সুর দেন। নিজেই গান। বনের পশু-পাখিরা পর্যন্ত সেই গান শুনে চোখের জল ফেলে।

পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে কবির লেখা গীত। গীতগুলি গদ্যের মতো সরল নয়। ছেলেমানুষি ছড়া।

এই লেখার পর প্রায় দু' বছর আর কিছু লেখা হয় নি। দু' বছর পর হঠাৎ লেখা—আমার জীবন। গদ্য এখানে অনেক স্বচ্ছ, গতিময়। হাতের লেখাও বদলে গেছে। আগের গোটা-গোটা হরফ উধাও হয়েছে। এসেছে প্যাঁচানো ধরনের অক্ষর। আগের কোনো লেখায় কোনো রকম কাটাকুটি নেই। মনে হয় আগে অন্য কোথাও লিখে পরে খাতায় তোলা হত। আমার জীবন লেখাটিতে প্রচুর কাটাকুটি।

## আমার জীবন

আমি কি খুব বুদ্ধিমতী? মনে হয় না। কেউ কোনো হাসির কথা বললে আমি বুঝতে পারি না। আজ বড় খালার বাসায় সবাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিল। এটা যে ঠাট্টা, আমি বুঝতে পারি নি। কী নিয়ে কথা হচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। অবাক হয়ে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছি। বড় খালার মেয়ে বিনু হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। বড় খালা বললেন, কম বোঝাই তোমার জন্যে ভালো। বেশি বুঝলে বা বুঝতে চাইলে ঝামেলায় পড়বে। আমি এই কথারও মানে বুঝলাম না। মন-খারাপ করে বাসায় চলে এলাম। সারা দুপুর ভাবলাম। তখন একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হল—আমাকে বাবা এবং মা ছাড়া কেউ পছন্দ করেন না। যেমন বড় খালা, তিনি ছোট খালার ছেলেমেয়েকে তুই করে বলেন, মেজো খালার ছেলেমেয়েকে তুই করে বলেন; আমাকে বলেন তুমি করে।

সন্ধ্যাবেলা বাবাকে আমি এই কথাটা বললাম। বাবা চট করে খালাদের উপর রেগে গেলেন এবং বলতে লাগলেন—যাও কেন তাদের বাসায়? আর যাবে না। ওরাও এ-বাড়িতে আসবে না। দারোয়ানকে বলে দেব এলে যেন গেট খোলা না হয়।

বাবার রাগ যেমন চট করে ওঠে তেমনি চট করে নেমে যায়। এইবার তা হল না। কী লজ্জার কাণ্ড! পরদিন সকালবেলা বাবা বড় খালাকে টেলিফোন করে বললেন—আপনি সবাইকে তুই-তুই করে বলেন, আমার মেয়েটাকে তুমি বলেন কেন?

ভাগ্যিস বাবার এসব কাণ্ডকারখানা মা জানতে পারেন নি। জানলে খুব মন-খারাপ করতেন। মা'র হার্টের অসুখ খুব বেড়েছে। নড়াচড়াই করতে পারেন না। এই অবস্থায় মন-খারাপ করার মতো কোনো ঘটনা ঘটতে দেয়া উচিত নয়। কিন্তু বাবা এসব কিছু শুনবেন না। যা তাঁর মনে আসে, করবেন। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় মা'র এই অসুখের মূল কারণ হয়তো-বা বাবা। কী লিখছি আবোল-তাবোল, হার্টের অসুখের কারণ বাবা হতে যাবেন কেন? তাঁর মতো ভালো মানুষ ক'জন আছে?

আজ অনেক দিন পর অপালা তার খাতা নিয়ে বসেছে। কোনো কিছু লেখার উদ্দেশ্যে নয়। পুরনো লেখায় চোখ বোলানোর জন্যে। রাজ-নর্তকী গল্পটি সে পড়ছিল। এ-রকম একটা অদ্ভুত গল্প এত অল্প বয়সে সে কেন লিখেছিল ভাবতে-ভাবতে লজ্জায় গাল লাল হয়ে উঠল। এই গল্পটি ছিঁড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু খাতা থেকে পাতা ছিঁড়তে মায়া লাগে। এই গল্পটি এখন ভালো লাগছে না, আজ থেকে কুড়ি বছর পর

হয়তো–বা ভালো লাগবে।

'আফা।'

অপালা চমকে তাকাল। রমিলা যে উঠে এসেছে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, সে লক্ষই করে নি।

'আফনেরে নিচে ডাকে।'

'কে?'

'ঐ যে দাড়িওয়ালা লোকটা, ঘর ঠিক করে যে।'

'ও, আচ্ছা। বসতে বল, আমি আসছি।'

রমিলা গেল না, দাঁড়িয়ে রইল। অপালা শান্ত স্বরে বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বলবে?'

'আপনে দুপুরে কিছু খাইলেন না আফা।'

'খিদে ছিল না।"

'অখন এট্টু নাস্তাপানি আনি?'

'আন। আর ঐ লোকটাকে আগামী কাল আসতে বল। আমার নিচে নামতে ইচ্ছা করছে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

ফিরোজ ঘড়ি আনতে ভুলে গিয়েছে, কাজেই কতক্ষণ পার হয়েছে বলতে পারছে না। এই অতি আধুনিক বসার ঘরটিতে কোনো ঘড়ি নেই। সাধারণত থাকে। কোকিল–ঘড়ি বা এই জাতীয় কিছু। এক ঘন্টা পার হলেই খুট করে দরজা খুলে একটা কোকিল বের হয়। কু–কু করে মাথা ধরিয়ে দেয়। সময় পার হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপাটাই যন্ত্রণাদায়ক। এর মধ্যে কু–কু করে কেউ যদি সেটা মনে করিয়ে দেয়, তাহলে আরো খারাপ লাগার কথা। ঘড়ি চলবে নিঃশব্দে। কেউ জানতে চাইলে সময় দেখবে। যদি কেউ জানতে না–চায়, তাকে জোর করে জানানোর দরকার কী?

অ্যাসট্রেতে চারটি সিগারেট পড়ে আছে। এই থেকে বলা যেতে পারে, পঞ্চাশ মিনিটের মতো পার হয়েছে। পঞ্চাশ মিনিট অবশ্যি এক জন রাজকন্যার দর্শনলাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। রাজকন্যাদের জন্যে পঞ্চাশ ঘন্টা বসে থাকা যায়।

পর্দা সরিয়ে রমিলা ঢুকল, দাঁত কেলিয়ে বলল, আফা আসতাছে। ফিরোজ মনে–মনে বলল, ধন্য হলাম। রাজকন্যার আগমনবার্তা নকিব ঘোষণা করল। এখন সম্ভবত জাতীয় সঙ্গীত বাজবে—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

'ফিরোজ সাহেব, আপনি কি ভালো আছেন?'

'জ্বি, ভালো।'

'আপনি ঐ দিন এসেছিলেন, আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, নিচে নামতে ইচ্ছা করছিল না। আপনি কিছু মনে করেন নি তো?'

'না না, কিচ্ছু মনে করি নি। একা–একা বসে থাকতে আমার ভালোই লাগে।'

'আপনার ঐ কাজের ব্যাপারটা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তিনি "ওকে" বলেছেন।'

'প্রথমে তো আপনি "নো" বলে দিয়েছিলেন, আবার কেন.....'

'আপনার চাকরি চলে যাবে বলছিলেন যে, তাই। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

ফিরোজ বসল। বসতে গিয়ে মনে হল, এই মেয়েটি বসবে না। কথা বলবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। যে-কোনোভাবেই হোক, বুঝিয়ে দেবে, তুমি আর আমি একই আসনে পাশাপাশি বসতে পারি না। সেটা শোভন নয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মেয়েটি বসল! ফিরোজ বলল, 'আমি অবশ্যি খুব ভয়ে-ভয়ে এসেছি। ভেবেছি আপনি গালাগালি করবার জন্যে আমাকে ডেকেছেন।'

'কী আশ্চর্য! গালাগালি করব কেন?'

'যেদিন আপনি আমার কাজ বন্ধ করে দিলেন, সেদিন রাগ করে আপনাদের একটা দামী কাপ ভেঙে ফেলেছিলাম।'

'তাই নাকি! বাহ্, বেশ তো!'

'আপনি জানতেন না?'

অপালা অবাক হয়ে বলল, 'সামান্য কাপ ভাঙার ব্যাপারে আমি জানব কেন?'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি যে-দিন ইচ্ছা কাজ শুরু করতে পারেন। যে-কোনো প্রয়োজনে আমাদের ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথা বললেই হবে। আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, নিচে সাধারণত নামি না।'

'কিসের এত পড়াশোনা?'

'অনার্স ফাইন্যাল।'

'ও, আচ্ছা। আপনাকে অবশ্যি অনার্স ফাইন্যালের ছাত্রী মনে হয় না। মনে হয় কলেজ-টলেজে পড়েন।'

অপালা কিছু বলল না। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। ফিরোজ সেটা লক্ষ করল না। ফুর্তির ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'পড়াশোনা করতে-করতে যদি ব্রেইন টায়ার্ড হয়ে যায়, তাহলে চলে আসবেন, আমি কাজ বন্ধ রেখে আপনার সঙ্গে গল্প-গুজব করব, ব্রেইন আবার ফ্রেশ হয়ে যাবে।'

'তার মানে? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

ফিরোজ অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটির মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। ঠোঁট অল্প-অল্প কাঁপছে। এতটা রেগে যাবার মতো কিছু কি সে বলেছে?

'আপনি হঠাৎ এমন রেগে গেলেন কেন? আমি অন্য কিছু ভেবে এটা বলি নি। আপনার চেয়ে অনেক-অনেক রূপবতী একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সেই মেয়েটিকে আগামী সপ্তাহে আমি বিয়ে করছি। দেখুন, তার ছবি দেখুন।'

ফিরোজ হাজি সাহেবের মেয়ের ছবিটি টেবিলে রাখল। ভাগ্যিস ছবিটি সঙ্গে ছিল! মেয়েটি একদৃষ্টিতে ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছে। ফিরোজ সহজ স্বরে বলল, 'আপনাকে গল্প করতে এখানে আসতে বলার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আশা করি এটা আপনি বুঝতে পারছেন। আরেকটি কথা, যদি সে-রকম কোনো উদ্দেশ্য

আমার থাকে, তাহলে সেটা কি খুব দোষের কিছু? ভাগ্যগুণে বিরাট এক বড়লোকের ঘরে আপনার জন্ম হয়েছে, আমার ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন ছিল না। তাই বলে আমার যদি আপনাকে ভালো লাগে, সেটা আমি বলতে পারব না? যদি বলি সেটা দোষের হয়ে যাবে?'

অপালা উঠে দাঁড়াল। ফিরোজ বলল, 'কথার জবাব না-দিয়েই চলে যাচ্ছেন? আমি কাজ করব কি করব না, সেটা অন্তত বলে যান।'

'কাজ করবেন না কেন? অবশ্যি আপনার ইচ্ছা না-করলে ভিন্ন কথা।'

ফিরোজ কাজে লেগে পড়ল। মতিনের ডিজাইন রাখল না। সম্পূর্ণ নিজের পরিকল্পনা। পছন্দ হলে হবে, না হলে হবে না। এক সপ্তাহ সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কাজ। এর মধ্যে অপালাকে একটি বারের জন্যেও নিচে নামতে দেখা গেল না। এক বার কিছু সময়ের জন্যে বারান্দায় এসেছিল, ফিরোজের দিকে চোখ পড়তেই চট করে সরে গেল। অপমানিত হবার মতো ঘটনা, কিন্তু ফিরোজকে তা স্পর্শ করল না। এক বার কাজে ডুবে গেলে অন্য কিছু তার মনে থাকে না। দেয়ালের ডিসটেম্পার বদলাতে গিয়ে মনে-মনে ভাবল—এই অহঙ্কারী মেয়ে থাকুক তার অহঙ্কার নিয়ে, আমার কিছুই যায়-আসে না। ডিসটেম্পারের রঙ কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। তার প্রয়োজন আকাশি রঙ, কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। হয় বেশি গাঢ় হয়ে যাচ্ছে কিংবা বেশি হালকা। কড়া হলুদ এক বার দিয়ে দেখলে হয়। এতে রোদের এফেক্ট চলে আসতে পারে। হলুদ সবার অপছন্দের রঙ। ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে ম্যাজিকের মতো এফেক্ট সৃষ্টি হতে পারে। সে চতুর্থ বার ডিসটেম্পার বদলে আবার আগের নীল রঙে ফিরে গেল। গৃহসজ্জায় দেয়াল খুবই জরুরি। এই দেয়ালের রঙ ঘরকে বন্দি করে ফেলবে কিংবা মুক্তি দেবে।

কাজ শেষ হবার পরও অপালা দেখতে গেল না। রমিলাকে বলল, 'চলে যেতে বল। আর ম্যানেজারবাবুকে বল টাকাপয়সা মিটিয়ে দিতে।'

'দাড়িওয়ালা লোকটা আফনের পছন্দ হয়েছে কি না জানতে চায়।'

'পছন্দ হয়েছে। বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'দেখলেন না তো আফা!'

'দেখতে ইচ্ছা করছে না।'

অপালা তার দু' দিন পর নিশানাথবাবুর সঙ্গে ঘর দেখতে গেল। তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! কি-রকম ফাঁকা-ফাঁকা শান্তি-শান্তি ভাব। মেঝেতে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কার্পেটের মতো শীতল পাটি। ছোট-ছোট বেতের চেয়ারে হালকা নীল রঙের গদি। চেয়ারগুলি একটি গোল সেন্ট্রাল টেবিলের চারপাশে এমনভাবে সাজানো, যেন পদ্মফুল ফুটে আছে। শীতল পাটিটিকে লাগছে দিঘির কালো জলের মতো। দেয়ালে একটিমাত্র জলরঙ ছবি। ঘন বন, মাঝখানে ছোট্ট একটি জলা। সেই জলার পানিতে আকাশের নীল রঙের ছায়া পড়েছে। একটি ছোট্ট মেয়ে সেই পানিতে ভাসছে। সমস্ত ঘরটায় একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব চলে এসেছে। অপালার বিস্ময় কাটতে দীর্ঘ সময় লাগল।

'ম্যানেজারকাকু, কেমন লাগছে আপনার কাছে?'

'ভালোই তো।'

'শুধু ভালোই তো! আরো কিছু বলুন।'

'ছোকরা এলেমদার, তবে বিরাট ফক্কড়। যত টাকা নিয়েছে এই ঘর করতে, এর সিকি টাকাও লাগে না। ছোকরা বিরাট ফোরটোয়েন্টি।'

অপালা খিল-খিল করে হেসে উঠল। এ-রকম শব্দ করে সে কখনো হাসে না। নিশানাথবাবু এই মেয়েটির হঠাৎ এই উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝতে পারলেন না।

'ম্যানেজারকাকু।'

'বল মা।'

'আপনি ফিরোজ সাবেহকে জানিয়ে দেবেন যে তাঁর সাজানো ঘর আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাবেন।'

'দরকার কী? কাজ করেছে পয়সা নিয়েছে।'

'না, আপনি লিখবেন। আজই লিখবেন। কী লিখলেন, সেটা আমাকে দেখিয়ে নেবেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'ম্যানেজারকাকু, ঐ ছবিটার দিকে দেখুন। একটা ছোট্ট মেয়ে পানিতে ভাসছে। আচ্ছা, মেয়েটা কি সাঁতার কাটছে, না পানিতে ডুবে মারা গেছে?'

'হবে একটা কিছু।'

'ছবিটার মধ্যে একটা গল্প আছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, আপনার মধ্যে একটা কষ্টের ভাব হবে।'

নিশানাথবাবু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবাক হয়ে বললেন, 'কই, আমার তো কিছু হচ্ছে না!'

অপালা আবার খিল-খিল করে হেসে ফেলল।

ফখরুদ্দিন সাহেবের মেজাজ অল্পতেই খারাপ হয়। দেশের মাটিতে সেই মেজাজ প্রকাশের যথেষ্ট পথ থাকলেও বিদেশে সম্ভব হয় না। আজ একের পর এক যে-সব কাণ্ড ঘটেছে, তাতে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেলেও দোষের ছিল না। কিন্তু তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখেছেন। প্লেনে তাঁর পাশের সহযাত্রিণী অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে হড়-হড় করে বমি করল, তার খানিকটা এসে পড়ল তাঁর গায়ে। তিনি মুখ বিকৃত করে বললেন, 'ইটস অলরাইট।' এয়ার হোস্টেস সাবান-পানি দিয়ে তাঁর কোট কয়েকবার মুছে দিল। তবু বমির উৎকট গন্ধ গেল না। টয়লেটে গিয়ে কাপড় বদলানো যেত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটিমাত্র ব্রিফকেস। বড় স্যুটকেস দু'টি লাগেজ-কেবিনে।

প্লেন থেকে নামার সময়ও ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটল। সিঁড়িতে বেকায়দায় পা পড়ে পা মচকে গেল।

ইমিগ্রেশন অফিসারের সঙ্গেও কিছু কথা-কাটাকাটি হল। অফিসারটি বলল, 'তুমি লণ্ডনে কী জন্যে যাচ্ছ।?'

তিনি বললেন, 'তা দিয়ে তোমার কী দরকার? আমার পাসপোর্টে ভিসা দেয়া আছে। সেই ভিসায় আমি ঢুকব।'

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কেন যাচ্ছ, বিজনেস ট্রিপ, না প্লেজার ট্রিপ?'

ফখরুদ্দিন সাহেব বিরস গলায় বললেন, 'সর্দি ঝাড়ার জন্যে যাচ্ছি। তোমার এই দেশ নাকের সর্দি ফেলার জন্যে অতি উত্তম।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করবার চেষ্টা করছ?'

'হ্যাঁ, করছি।'

'তোমার ব্রিফকেস খোল, হ্যাণ্ডব্যাগ খোল। চেকিং হবে।'

'এক বার হয়েছে।'

'আরো দশ বার হবে। তোমার সঙ্গে টাকাপয়সা কী পরিমাণ আছে?'

'যথেষ্টই আছে।'

'পরিমাণটা বল।'

'পরিমাণ তোমাকে বলার প্রয়োজন দেখছি না। লিখিতভাবে আগেই এক বার বলা হয়েছে।'

'সুবোধ বালকের মতো আরো এক বার বল।'

'যদি বলতে না চাই?'

'তুমি এস আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব। চল, যাওয়া যাক।'

ফখরুদ্দিন সাহেবকে তিন ঘন্টা বসিয়ে রাখা হল। যখন ছাড়া পেলেন, তখন তাঁর শরীর অবসন্ন। একটু পর পর বমি আসছে। বমির বেগ সামলাতে হচ্ছে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা।

হোটেলে পৌঁছেই বাংলাদেশে কল বুক করতে চাইলেন। বলা হল—স্যাটেলাইটে ডিসটারবেন্স আছে, ওভারসিজ কল ছ' ঘন্টার আগে করা যাবে না।

হেলেনার খোঁজে তাঁর নার্সিং হোমে টেলিফোন করলেন। এ্যাটেনডেন্ট নার্স বলল, 'পেসেন্ট ঘুমুচ্ছে।'

ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'আমি ওর স্বামী।'

নার্স মধুর হেসে বলল, 'তুমি পেসেন্টের স্বামীই হও বা প্রেমিকই হও, হার্টের রুগীকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা যাবে না। সকাল আটটায় টেলিফোন করো, কেমন? এখন শান্ত হয়ে ঘুমাও। রাত কত হয়েছে সেটা বোধহয় তুমি জান না। গুড নাইট।'

রুম-সার্ভিসকে কফি দিতে বলেছিলেন। সেই কফি এল এক ঘন্টা পর। চুমুক দিয়ে তাঁর মনে হল, তিনি কুইনাইন-গোলা গরম পানি খাচ্ছেন।

সারা রাত তাঁর ঘুম হল না। ছটফট করতে লাগলেন। শেষরাতের দিকে প্রবল জ্বরে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল। তাঁর মনে হল এই হোটেলে তাঁকে মরতে হবে। আত্মীয়-পরিজনহীন নির্জন একটি ঘরে। শেষ মুহূর্তে পানি-পানি করে চেঁচাবেন—কেউ শুনবে না। কোনো প্রিয় মানুষের মুখ দেখতে চাইবেন, দেখতে পারবেন না।

প্রিয় মুখ এই সংসারে তাঁর নেই। বাবার মুখ আবছাভাবে মনে পড়লেও মা'র মুখ

মনে পড়ে না। বাবার মুখও অস্পষ্ট, তাঁর মুখে বসন্তের দাগ ছিল। মাথায় চুলগুলি ছিল লালচে ধরনের কোঁকড়ানো। স্মৃতি বলতে এই। অবশ্যি এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা কোনোকালেই ছিল না। যা চলে গিয়েছে, তা নিয়ে বুক চাপড়ানো এক ধরনের বিলাসিতা। এই বিলাসিতা কবি এবং শিল্পীর জন্যে ঠিক আছে। তাঁর জন্যে ঠিক নয়। তাঁর চোখ পিছনের দিকে নয়, সামনের দিকে।

তিনি রুম-সার্ভিসের বোতাম টিপলেন। লাল বাতি জ্বলে জ্বলে উঠছে। কেউ আসছে না। অসম্ভব ক্ষমতাবান লোকেরা প্রায় সময়ই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যায়।

দরজায় নক হচ্ছে। কেউ বোধহয় এসেছে। ফখরুদ্দিন সাহেব বহু কষ্টে বললেন, 'কাম ইন।'

লালচুলের বেঁটেখাটো এক জন মহিলা উঁকি দিল। ভয়-পাওয়া গলায় বলল, 'তোমার কী হয়েছে?'

ফখরুদ্দিন সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন।

মনে হচ্ছে ফিরোজের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে।

বি. করিম সহেবের বন্ধু তাঁকে সহকারী ডিজাইনার হিসেবে নিয়েছেন। ভদ্রলোক ছোটখাটো। মাগুর মাছের মতো কালো রঙ। ফিটফাট বা বু সেজে থাকেন। তাঁর কাছে গেলেই আফটার শেভ লোশনের কড়া গন্ধে মাথা ধরে যায়। তাঁর নাম মন্তাজ মিয়া। ছবির লাইনে পনের বছর ধরে আছেন। এখন পর্যন্ত কোনো ছবি হিট করে নি। তাঁর ধারণা, এবারের ছবিটি করবে। ছবির নাম 'নয়া জিন্দেগি'—ইংরেজিতে ফ্রেশ লাইফ, নিউ লাইফ নয়।

এই ছবি হিট করবে, এ-রকম আশা করার সঙ্গত কারণ আছে। ছবিতে তিন জন হিরোইন। দু' জন মারা যায়। শেষ পর্যন্ত এক জন টিকে থাকে। হিরো এবং হিরোইন নয়া জিন্দেগি শুরু করে। ছ'টা গান আছে। প্রতিটি গানই কোলকাতার আর্টিস্টদের দিয়ে গাওয়ানো। ব্যালে ড্যান্স আছে, যা রেকর্ড করা হয়েছে কোলকাতার এক ক্যাবারেতে। প্রিন্সেস সুরাইয়া এমন এক ড্যান্স দিয়েছে, যা দেখে এই বুড়ো বয়সেও মন্তাজ মিয়ার বুক ধরফড় করে। সেন্সার এই জিনিস কেটে দিলে সর্বনাশ হবে। ছবির অর্ধেক কাজ বিদেশে হয়েছে, বাকি অর্ধেক দেশে হবে। বেশির ভাগই আউটডোরে। ইনডোরে হিরোর বসার ঘর এবং বারান্দা। এমন সেট করতে হবে, যাতে রিকশাওয়ালা শ্রেণীর দর্শকদের চোখ কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসে। ক্রমাগত সিটি বাজাতে থাকে।

মন্তাজ মিয়ার সঙ্গে ফিরোজের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল :

'তুমি করে বললে আপত্তি আছে?'

'জ্বি-না।'

'গুড। সবাইকে আমি তুমি করে বলি। এ-দেশের যে টপ নায়িকা, যার সাইনিং মানি পঁচিশ হাজার টাকা, তাকেও তুমি করে বলি।'

ফিরোজ তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

'তুমি কাজে লেগে পড়। কীভাবে কী করতে হয়, আগে শেখ। আমি যা চাই সেটা হচ্ছে গ্র্যামার। জি এল এ এম ও ইউ আর। বুঝলে?'

'জ্বি, বুঝলাম।'

'বোম্বের ছবিগুলি দেখ। দেখে কাজ শেখ।'

'হ্যাঁ, তাই করব।'

'বি· করিম সাহেব বলেছেন, তুমি প্রতিভাবান লোক। সত্যি নাকি?'

'জ্বি–না, সত্যি না।'

'গুড। ভেরি গুড। জি ও ও ডি। প্রতিভাবান লোকদের দিয়ে কিছু হয় না। আমি চাই কাজ। ওয়ার্ক। ডাবলিউ ও আর কে। বুঝলে?'

'জ্বি, বুঝলাম।'

'মদ্যপানের অভ্যাস আছে?'

'না।'

'অল্পসল্প খেতে পার। এতে দোষ নেই। অল্প খেলে মেডিসিনের মতো কাজ করে। ব্রেইন শার্প হয়। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলি যে এতদুর এগিয়ে গেছে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে—এর পিছনে অ্যালকোহলের একটা ভূমিকা আছে বলে আমার ধারণা।'

'আপনার ধারণা সত্যি হবারই সম্ভাবনা।'

'নায়িকাদের সঙ্গে খাতির জমাবার চেষ্ট করবে না। দূর থেকে ম্যাডাম বলে স্লামালিকুম দেবে। তারপর ভ্যানিশ হয়ে যাবে। ফিল্ম লাইনে তোমার হবে বলে আমার ধারণা।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার ই এম পি ক্ষমতা আছে। আগেভাগে বলে ফেলতে পারি। মন্দিরা যখন প্রথম ফিল্ম লাইনে আসে, তাকে দেখেই আমি বললাম, তোমার হবে।'

'হয়েছে?'

'হয়েছে মানে! দু' লক্ষ টাকার আর্টিস্ট এখন। শিডিউল নিতে হয় এক বছর আগে। আমাকে এখনো খুব মানে। সেদিন এক পত্রিকার ইন্টারভ্যুতে আমার নাম বলেছে।'

'মন্দিরা কাজ করছে নাকি আপনার ছবিতে?'

'তুমি এখন ফিল্ম লাইনের লোক। নায়িকাদের নাম ধরে কথা বলবে না। এখন থেকে প্র্যাকটিস কর। বল—মন্দিরা ম্যাডাম।'

ফিরোজ হেসে বলল, 'মন্দিরা ম্যাডাম।'

'হাসবে না। ফিল্ম লাইনে দাঁত বের করতে নেই। আচ্ছা, এখন যাও। কাল দু' নম্বর স্টুডিওতে চলে আসবে।'

ফিরোজ সেট তৈরি করে দিল। মন্তাজ মিয়া চোখ–মুখ কুঁচকে দীর্ঘ সময় সেই সেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফিরোজ বলল, 'মনে হচ্ছে আপনার মনমতো হয় নি?'

মন্তাজ মিয়া তারও জবাব দিলেন না।

'পছন্দ না হলে অদলবদল করে দেব। হাতে তো সময় আছে।'

'পছন্দ হয়েছে। ছোকরা, তোমার হবে।'

সেই সপ্তাহেই মধুমিতা মুভিজ–এর ব্যানারে নতুন যে–ছবিটি হবে, তার চীফ ডিজাইনার পদের অফার ফিরোজের কাছে চলে এল। ফিরোজ বলল, 'ভেবে দেখি।'

মধুমিতা মুভিজ–এর মালিক বললেন, 'ক'দিন লাগবে ভাবতে?'

'সপ্তাহখানেক লাগবে।'

'বেশ, ভাবুন। সপ্তাহখানেক পর আবার যোগাযোগ করব। আপনার টেলিফোন আছে?'

'জ্বি–না।'

'একটা টেলিফোন নিয়ে নিন। ছবির লাইনে টেলিফোনটা খুবই দরকারি।'

'নিয়ে নেব। শিগ্‌গিরই নিয়ে নেব। তারপর একটা গাড়ি কিনব। লাল রঙের। টু–ডোর। গাড়ি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে? মানে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ?'

পর–পর দু' দিন ফিরোজ ঘুমিয়ে কাটাল।

এ–রকম সে করে। তার ভাষায়, দুঃসময়ের জন্যে ঘুম স্টক করে রাখা। সেই স্টক–করা ঘুমের কারণে ভবিষ্যতে কোনো রকম আলস্য ছাড়াই না–ঘুমিয়ে থাকতে পারে। উট যেমন দুঃসময়ের জন্যে পানি জমা করে রাখে, অনেকটা সে–রকম। শুধু দুপুরে খাবার সময় পাশের 'ইরাবতী' হোটেলে খেতে গেছে। বাংলাদেশ হওয়ায় এই একটি লাভ ; সুন্দর–সুন্দর নামের ছড়াছড়ি। পানের দোকানের নাম 'ময়ূরাক্ষী'; জুতোর দোকানের নাম 'সোহাগ পাদুকা'।

ইরাবতী রেস্টুরেন্টের নাম হওয়া উচিত ছিল– 'নালাবতী'। পাশ দিয়ে কর্পোরেশনের নর্দমা গিয়েছে। নর্দমাগুলি বানানোর কায়দা এমন যে, পানি চলে যায়, কিন্তু ময়লা জমা হয়ে থাকে। সেই পূতিগন্ধময় নরকের পাশে খাবার ব্যবস্থা। তবে রান্না ভালো। পচা মাছও এমন করে রেঁধে দেয় যে দ্বিতীয় বার যেতে ইচ্ছে করে। ইরাবতী রেস্টুরেন্টে ফিরোজের তিন শ' টাকার মতো বাকি ছিল। সে বাকি মিটিয়ে আরো দু' শ' টাকা অ্যাডভান্স ধরে দিল। দিনকাল পাল্টে গেছে। অ্যাডভান্স পেয়েও লোকজন খুশি হয় না। ম্যানেজার এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কিছুক্ষণ আগে একটি জ্যান্ত ইঁদুর গিলে ফেলেছে। সেই ইঁদুর হজম হয় নি, পেটে নড়াচড়া করছে।

ফিরোজ বলল, 'আছেন কেমন ভাইসাব?'

'ভালোই। আপনারে তো দেখি না।'

'সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত। সিনেমায় নেমে পড়েছি, বুঝলেন?'

ম্যানেজার ফুস করে বলল, 'ভালোই।'

'আপাতত হিরোইনের বড় ভাইয়ের রোল করছি। মোটামুটি একটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার। বই রিলিজ হলে দেখবেন। পাস দিয়ে দেব।'

'নাম কী বইয়ের?'

'নয়া জিন্দেগি। হিট বই হবে।'

ফিরোজ রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে মিষ্টি পান কিনল। রাতে আর খেতে আসবে না। ঘরেই যা হোক কিছু খেয়ে নেবে, কাজেই পাউরুটি, কলা এবং এক কৌটা মাখন কিনল। বাজারে নতুন বরই উঠেছে, খেতে ইচ্ছা করছে। ভাংতি টাকা সব শেষ। একটা

পাঁচ শ' টাকার নোট আছে, সেটা ভাঙাতে ইচ্ছা করছে না। বরই না-কিনেই সে ফিরে এল। ছেলেমানুষি একটা আফসোস মনে জেগে রইল।

হাজি সাহেব বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে আছেন। ফিরোজ হাসিমুখে এগিয়ে গেল।

'স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ফিরোজ সাহেব?'

'জ্বি, ভালো।'

'ক'দিন ধরে দেখি না আপনাকে?'

'দারুণ ব্যস্ত! আজ একটু ফাঁকা পেয়েছি, ভাবলাম আপনাকে জরুরি কথাটা বলে যাই।'

'কী জরুরি কথা?'

'ঐ যে আপনার মেয়ের ছবি নিয়ে গেলাম যে!'

'ও, আচ্ছা। বসেন, চা খাবেন?'

'তা খাওয়া যায়।'

হাজি সাহেব ভেতরে গিয়ে চায়ের কথা বলে এলেন। ফিরে এসে আগ্রহী চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'ঐ যে আপনার কাছ থেকে ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম, ছবি দেখে সবার এক কথা—মেয়ে কি ছবির মত সুন্দর? ফটোজেনিক ফেস ভালো থাকলে অনেক সময় এলেবেলে মেয়েকেও রাজকন্যার মতো লাগে।'

হাজি সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

'মেয়ে যদি ছবির কাছাকাছিও হয়, তাহলেও ওদের কোনো আপত্তি নেই। যেদিন বলবেন, সেদিনই বিয়ে।'

আপনি কি মেয়ের অসুবিধার কথাটা বলেছেন?'

'পাগল হয়েছেন! এখন আমি এইসব বলব? কথাবার্তা মোটামুটি পাকা হয়ে যাবার পর খুব কায়দা করে.....।'

'না, যা বলবার এখনই বলবেন। মেয়েকে আমি একটা বাড়ি লিখে দেব, এটাও বলবেন। ৪৩ কাঁঠাল বাগান। একতলা বাড়ি। ইচ্ছা করলে বাড়ি দেখে আসতে পারেন

'মেয়েই দেখলাম না, আর বাড়ি!'

'বাড়িটাই লোকে আগে দেখে, মেয়ে দেখে পরে। তবে মেয়েকে আপনি দেখবেন। আসতে বলেছি। আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি।'

তারা বসার ঘরে পা দেয়ামাত্র হাজি সাহেবের ছোট মেয়েটি ঘরে ঢুকল। কী শান্ত, স্নিগ্ধ মুখ। গভীর কালো চোখে ডুবে আছে চাপা কষ্ট। সেই কষ্টের জন্যেই বুঝি এমন টলটলে চোখ।

ফিরোজ বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, বস।'

মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে বসল। তার আচার-আচরণে কিছুমাত্র জড়তা লক্ষ করা গেল না। সে সরাসরি তাকিয়ে আছে, চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না।

'কি নাম তোমার?'

'লতিফা।'

'প্রায় চার বছর তোমাদের এদিকে আছি। নামটা পর্যন্ত জানি না। খুবই অন্যায়। তুমি কি আমার নাম জান?'

'জানি।'

হাজি সাহেব বললেন, 'লতিফা, তুই এখন ভেতরে যা। চা দিতে বল।'

লতিফা সঙ্গে-সঙ্গে উঠে চলে গেল। ফিরোজ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ফেলল। তার ইচ্ছে করছে, বলে—পাত্র হিসেবে আমাকে আপনার কেমন লাগে?

বলা হল না। আধুনিক সমাজে বাস করার এই অসুবিধে। মনের কথা খোলাখুলি কখনো বলা যায় না। একটি মেয়েকে ভালো লাগলেও তাকে সরাসরি সেই কথা বলা যাবে না। অনেক ভণিতা করতে হবে। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হবে।

হাজি সাহেব বললেন, 'আমার মেয়েটা বড় আদরের।'

ফিরোজ কিছু বলল না। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটার একটা আলাদা মজা আছে। যে-কোনো দিকে যাওয়া যায়, যেখানে ইচ্ছে সেখানে থেমে যাওয়া যায়। এই সৌভাগ্য ক'জনার হয়? সবাই ব্যস্ত। সবাই ছুটছে। এর মধ্যে দু'-এক জন অন্য রকম থাকুক না, যাদের ছোটার ইচ্ছে নেই, প্রয়োজনও নেই।

এখন প্রায় বিকেল। হাঁটতে-হাঁটতে অপালাদের বাড়ির সামনে চলে যাওয়া যায়। কেন জানি এই অহঙ্কারী মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তার কঠিন মুখ, চোখের তীব্র দৃষ্টিও কেন জানি মধুর। এর ব্যাখ্যা কী? কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই রহস্যময় পৃথিবীর অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি, দার্শনিক, শিল্পী—এঁরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা কত যুগ আগে শুরু হয়েছে, এখনও চলছে। ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় নি।

'ফিরোজ সাহেব, কী ভাবছেন?'

'কিছু ভাবছি না। শরীরটা খারাপ লাগছে।'

'সে কী!'

'আজ আর চা-টা কিছু খাব না। ডাক্তারের কাছে যাব। বমি-বমি লাগছে।'

ফিরোজ বমির ভঙ্গি করে চোখ-মুখ উল্টে দিয়ে বলল, 'কাল রাতেও চার বার বমি হয়েছে। আমি উঠলাম।'

অপালাদের বাড়ির সামনে ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন তাকে দেখা না-যায়। মানুষের অদৃশ্য হবার ক্ষমতা থাকলে বেশ হত। মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে দেখা যেত সে কী করছে। এই মুহূর্তে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। চেইনে বাঁধা ভয়াবহ কুকুর দু'টি চেইন ছিঁড়ে ফেলবার একটা কসরত করছে। মালীকে নিড়ানি হাতে দেখা যাচ্ছে। এ-ছাড়া সব ফাঁকা।

'স্যার।'

ফিরোজ চমকে উঠল।

'আপনাকে ডাকে স্যার।'

'কে ডাকে?'

'আপা আপনাকে যাইতে বলছে।'

'কোন আপা?'

'অপালা আপা।'

'সে কী। কোথায় তিনি?'

অপালাদের দারোয়ান তার উত্তর দিল না। দারোয়ান-শ্রেণীর লোকেরা কথা কম বলে।

মেয়েটিকে সম্পূর্ণ অন্য রকম লাগছে। ফিরোজ ভেবে পেল না একই মেয়েকে একেক দিন একেক রকম লাগে কেন। এর পিছনের রহস্যটা কী? সাজগোজের একটা ব্যাপার থাকতে পারে। তার ভূমিকা কতই-বা আর হবে? চোখে কাজল দিয়ে চোখ দু'টিকে টানা-টানা করা যায়। চুল মাঝখানে সিঁথি না-করে বাঁ দিকে করে খানিকটা বদলানো যায়। পার্ম করে চুলে ঢেউ খেলানো নিয়ে আসা যায়, কিন্তু তার পরেও তো মানুষটি ঠিকই থাকবে।

'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

ফিরোজ বসল। বসতে-বসতে মনে হল অপালার গলার স্বরও এখন অন্য রকম লাগছে। একটু যেন ভারী। আগেকার তরল কণ্ঠস্বর নয়।

'আপনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর আগেও একদিন এসে ছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যান। কেন বলুন তো?'

ফিরোজ কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু এই মুহূর্তেই বলা উচিত। মেয়েটি জবাব শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছে। জবাবের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। জবাব যদি তার পছন্দ হয়, তাহলে সে ফিরোজের সামনের চেয়ারটায় বসবে, পছন্দ না-হলে বসবে না। অহঙ্কারী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে।

অপালা বলল, 'আপনার যদি আপত্তি থাকে তাহলে বলার দরকার নেই।'

'না, কোনো আপত্তি নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হবে এই আশাতেই দাঁড়িয়ে থাকি। দু' দিন মাত্র নয়, তার আগেও কয়েক বার এসেছি।'

ফিরোজ লক্ষ করল, মেয়েটির চেহারা কঠিন হতে শুরু করেছে। কী প্রচণ্ড রাগ এই মেয়ের! গাল কেমন টকটকে লাল হয়ে গেল—ঠোঁট কাঁপছে। মেয়েটি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। সামলাতে পারছে না। মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই মেয়ের তেমন অভ্যাস নেই। অভ্যাস থাকলে খুব সহজেই নিজেকে সামলাতে পারত। ফিরোজ বলল, 'আমার সব কথা না শুনেই আপনি রেগে যাচ্ছেন। সবটা আগে শোনা ভালো নয় কি?

'বলুন, শুনছি।'

'আপনি বসুন, তারপর বলছি। আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বসে-বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলব, তা তো হয় না। আর আপনি যদি মনে করেন যে আমার স্তর আর আপনার স্তর আলাদা, তাহলে অবশ্যি ভিন্ন কথা।'

অপালা বসল। সে তাকিয়ে আছে ফিরোজের দিকে, এক বারও চোখ ফিরিয়ে

নিচ্ছে না। এটিও একটা মজার ব্যাপার। এই বয়সের অবিবাহিত মেয়েরা দীর্ঘ সময় পুরুষমানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। অসংখ্য বার তারা চোখ নামিয়ে নেয়।

'কি বলবেন, বলুন।'

'আমি নিজের মতো করে আপনাদের একটা ঘর সাজিয়ে দিয়েছি। সেটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে কি হয় নি আমাকে কিছু বলেন নি। আমার জানতে ইচ্ছা করে। জানবার জন্যেই আসি।'

'আসেন তো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?'

'আপনাদের দু'টি বিশাল কুকুর আছে। আমি কুকুর ভয় পাই। ছোটবেলায় আমাকে দু' বার পাগলা কুকুরে কামড়েছে।'

অপালার কঠিন মুখ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। গালের লাগ রঙ এখন অনেকটা কম, নিঃশ্বাস সহজ।

'আপনার কাজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি ম্যানেজারকাকুকে বলেছিলাম, চিঠিতে আপনাকে জানানোর জন্যে। তিনি বোধহয় জানাতে ভুলে গেছেন।'

'চিঠিতেই যখন জানানোর জন্যে বলেছেন, আপনি নিজেও তো জানাতে পারতেন। পারতেন না?'

'হ্যাঁ, পারতাম।'

'কাজ আপনার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। এখন তাহলে উঠি।'

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। মনে ক্ষীণ আশা, মেয়েটি বলবে, বসুন, চা খেয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা এইটুকু ভদ্রতা সে কি করবে না?'

অপালা বলল, 'আপনি বসুন। আমার সঙ্গে চা খান।'

ফিরোজ সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়ল। একবার ভেবেছিল রাগ দেখিয়ে বলবে—চা লাগবে না। সেটা বিরাট বোকামি হত। এ যে-ধরনের মেয়ে, দ্বিতীয় বার অনুরোধ করবে না। দু' জন চুপচাপ বসে আছে। মেয়েটি চায়ের কথা বলার জন্যে ভেতরে যাচ্ছে না, কিংবা কাউকে ডেকেও কিছু বলছে না। এই পয়েন্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হল, মেয়েটি তাকে ডাকতে পাঠাবার আগেই বলে দিয়েছে—আমরা খানিকক্ষণ গল্প করব, তখন আমাদের চা দেবে। অর্থাৎ কিছুক্ষণ সে গল্প করবে।

অপালা বলল, 'আসুন, আমরা বারান্দায় বসে চা খাই। আমার চা খাবার একটা আলাদা জায়গা আছে। বিকেলের চা বন্ধ ঘরের ভেতর বসে খেতে ইচ্ছা করে না।'

চা খাবার জায়গাটি অপূর্ব! যেন একটি পিকনিক স্পট। চারদিকে ফুলের টব। বড়-বড় কসমস ফুটে রয়েছে। দিনের সামান্য আলোতেও তারা আনন্দে ঝলমল করছে। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সেই সরঞ্জাম দেখে ফিরোজ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপল। কারণ একটিমাত্র চায়ের কাপ। ওরা এক জনের চা-ই দিয়েছে।

অপালা টেবিলের পাশে দাঁড়ানো মেয়েটিকে বলল, 'অরুণা ও বরুণাকে বেঁধে রাখতে বল। আরেকটি চায়ের কাপ দিয়ে যাও।'

কাজের মেয়েটি সন্দেহজনক দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে যাচ্ছে। কর্মচারীর মতো যে ঢুকেছে, সে মুনিবের মেয়ের সঙ্গে চা খাচ্ছে, দৃশ্যটিতে সন্দেহ করার মতো অনেক কিছুই আছে।

'আমার চায়ের জায়গাটা আপনার কেমন লাগছে?'

'খুব ভালো লাগছে।'

'আপনার বোধহয় একটু শীত-শীত লাগছে। এ-রকম একটা পাতলা জামা পরে কেউ শীতের দিনে বের হয়!'

আহ্, কী সহজ-স্বাভাবিক সুরে মেয়েটি কথা বলছে! কী প্রচুর মমতা তার গলায়! ফিরোজের মন কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেল।

'আপনার বিয়েটা এখনো হয় নি, তাই না?'

'কোন বিয়ে?'

'ঐ যে একটি মেয়ের ছবি দেখালেন। বলছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে হবে।

'ও, আচ্ছা। না, এখনো হয় নি। সামনের মাসে হবার সম্ভাবনা। মেয়ের এক চাচা আমেরিকাতে থাকেন। ছুটি পাচ্ছেন না বলে আসতে পারছেন না। মেয়ে আবার খুব আদরের। কেউ চায় না যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে বিয়ে হোক। বাঙালি হচ্ছে সেন্টিমেন্টাল জাত, বুঝতেই পারছেন।'

প্রচুর মিথ্যা বলতে হয় বলেই মিথ্যা বলার আর্ট ফিরোজের খুব ভালো জানা। মিথ্যা কখনো এক লাইনে বলা যায় না। মিথ্যা বলতে হয় আঁটঘাট বেঁধে। সত্যি কথার কোনো ডিটেল ওয়ার্কের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মিথ্যা মানেই প্রচুর ডিটেল কাজ।

অপালা বলল, 'আপনি যে এখনো বিয়ে করেন নি, সেটা কীভাবে বুঝলাম বলুন তো?'

'কীভাবে বুঝলেন?'

'আপনার গায়ের পাতলা জামা দেখে। এই ঠাণ্ডায় আপনার স্ত্রী কিছুতেই এমন একটা জামা গায়ে বাইরে ছাড়তেন না।'

ফিরোজ লক্ষ করল, মেয়েটি ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে হাসছে, যেন এই বিরাট আবিষ্কারে সে উল্লসিত।

'আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন?'

'হ্যাঁ, খাব। এক কাপ খেলে খালে পড়ার সম্ভাবনা।'

'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে খুব অহঙ্কারী মেয়ে ভেবে বসে আছেন, তাই না? আমি কিন্তু মোটেই অহঙ্কারী না।'

'তাই তো দেখছি!'

'একা-একা থাকতে-থাকতে স্বভাবটা আমার কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে।'

'একা-একা থাকেন কেন?'

'ইচ্ছা করে কি আর থাকি? বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। মা অসুস্থ। বাবা সারাক্ষণই বাইরে-বাইরে ঘুরছেন।'

'অন্য আত্মীয়স্বজনরা আসেন না?

'না।'

'কেন?'

'জানি না কেন। আমাকে বোধহয় পছন্দ করেন না।'

'আপনাকে পছন্দ না-করার কী আছে? আমার তো মনে হয় আপনার মতো চমৎকার মেয়ে এই গ্রহে খুব বেশি নেই।'

ফিরোজ লক্ষ করল, মেয়েটি আবার রেগে যাচ্ছে। তার মুখে আগের কাঠিন্য ফিরে

আসছে। ফিরোজের আফসোসের সীমা রইল না। অপালা বলল, 'আসুন, আপনাকে গেট পর্যন্ত আগিয়ে দিই।'

অর্থাৎ অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় বলা—বিদেয় হোন। ফিরোজের মন-খারাপ হয়ে গেল। আরেক বার আসার আর কোনো উপলক্ষ নেই। দিন সাতেক পর সে যদি এসে বলে—ঐদিন একটা খাম কি আপনার এখানে ফেলে গেছি—তাহলে তা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? মনে হয় না। এই মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী।'

সে গেট পর্যন্ত ফিরোজের সঙ্গে-সঙ্গে এল, কিন্তু একটি কথাও বলল না। ফিরোজ যখন বলল, 'যাই তাহলে।' সে তার জবাবেও চুপ করে রইল। শুধু দারোয়ানকে বলল, 'অরুণা এবং বরুণাকে এখন ছেড়ে দাও।'

নিশানাথবাবু রাতের বেলা খবর নিতে এলেন। এই মানুষটি সাধারণত খুব হাসিখুশি। কিন্তু আজ কেমন যেন গম্ভীর লাগছে। মুখে খুব চিন্তিত একটা ভঙ্গি। অপালা বলল, 'ম্যানেজারকাকু, আপনার কি শরীর খারাপ?'

'না, শরীর ভালোই আছে।'

'বাবার কোনো খবর পেয়েছেন?'

'না। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেছেন, সেই খবর জানি। তারপর আর কিছু জানি না। স্যার মাঝে-মাঝে এ-রকম ডুব মারেন, তখন সব সমস্যা একসঙ্গে শুরু হয়।'

'কোনো সমস্যা হচ্ছে কি?'

'না, তেমন কিছু না।'

নিশানাথবাবু এড়িয়ে গেলেন। অপালার মনে হল, বড় কোনো সমস্যা হয়েছে। কারখানাসংক্রান্ত কোনো সমস্যা, যা এরা অপালাকে বলবে না। অপালারও এ-সব শুনতে ইচ্ছে করে না। সমস্যা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভালো।

'ম্যানেজারকাকু!'

'কি মা?'

'ফিরোজ বলে যে-ছেলেটি আমাদের ঘর ঠিক করে দিল, তাকে একটি চিঠি দিতে বলেছিলাম, দেন নি কেন?'

নিশানাথবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'দিয়েছি তো!'

'ও, তাহলে উনি বোধহয় পান নি। রেজিস্ট্রি করে দেয়া দরকার ছিল।'

'রেজিস্ট্রি করেই তো দিয়েছি! চিঠির সঙ্গে একটা রেভিনিউ স্ট্যাম্প-বসানো রিসিট ছিল। উনি তো সেখানে সই করে ফেরত পাঠিয়েছেন। কাজেই আমার চিঠি না-পাওয়ার তো কোনো কারণ নেই। আমি বরং কাল তাঁকে জিজ্ঞেস করব।

'না, জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।'

নিশানাথবাবু ইতস্তত করে বললেন, 'ছেলেটি আজ এখানে এসেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এদের বেশি প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না, মা। কাজ করেছে টাকা নিয়েছে, ব্যস, ফুরিয়ে গেল। আবার এসে এত কিসের চা খাওয়াখাওয়ি!'

অপালা অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। নিশানাথবাবুর হঠাৎ এখানে আসার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হচ্ছে। তিনি এমনি-এমনি আসেন নি। নিশ্চয়ই তাঁকে খবর দেয়া হয়েছে।

টেলিফোনে জানানো হয়েছে।

'মা অপালা।'

'জ্বি।'

'তুমি একা-একা থাক, তোমার বোধহয় খারাপ লাগে।'

'না, আমার খারাপ লাগে না।'

'খারাপ না-লাগলেও লোনলি তো নিশ্চয়ই লাগে। আমি তোমার কাকিমাকে বলেছি, সে এসে থাকবে।'

'কোনো দরকার নেই।'

'না, দরকার আছে।'

'বেশ, দরকার থাকলে তাঁকে নিয়ে আসুন। তবে আপনি কিন্তু কাকু শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন। ঐ ছেলে আর এখানে আসবে না।'

নিশানাথবাবুকে কোনো কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে অপালা উঠে গেল। তার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

ফখরুদ্দিন সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, 'আমি একটা টেলিফোন করব। দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।'

যে-নার্স তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে, সে বলল, 'আরো একটু ভালো হয়ে নাও, তারপর করবে।'

'আমি ভালো আছি।'

'তুমি মোটেও ভালো নও। খুবই অসুস্থ।'

'কতটা অসুস্থ?'

'অনেকটা। তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে—ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফিরে এসেছ।'

'এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাকে একটি টেলিফোন করতে দাও।'

'নিশ্চয়ই করবে। আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে চাও তো? সে-ব্যবস্থা আমরা করেছি। তোমাদের এম্ব্যাসিকে জানানো হয়েছে। তারা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।'

'আমাদের এম্ব্যাসির কাজকর্ম সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। ওরা কিছুই করে নি। যে-নোট তোমরা পাঠিয়েছ, সেই নোট ওরা এখনো পড়ে নি। খাম খোলা হয় নি বলেই আমার ধারণা।'

নার্স কোনো কথা বলল না। ফখরুদ্দিন সাহেবের বাঁ হাতে একটি ইনজেকশন করল। ফখরুদ্দিন সাহেব আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল রাত ন'টায়। টেলিফোনে প্রথম কথা বললেন অপালার সঙ্গে।

'বাবা, তুমি! সবাই চিন্তায় অস্থির। তোমার কোনো খোঁজ নেই। মা'র সঙ্গে ঐ দিন কথা হল, মাও তোমার কোনো খোঁজখবর জানে না। তুমি আছ কেমন?'

'খুব ভালো আছি।'

'গলার স্বর এমন লাগছে কেন?'

'সর্দি লেগেছে। কথাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন তো তাও কথা বলতে পারছি।'

'তুমি কথা বলছ কোত্থেকে?'

'লণ্ডন থেকেই বলছি।'

'এতদিন ডুব মেরে ছিলে কেন?'

'দেখলাম ডুব মেরে থাকতে কেমন লাগে। এক দিন তো ডুব মারতেই হবে। হা হা হা। তোমার খবর কি?'

'আমার কোনো খবর নেই। বসার ঘর ঠিক করা হয়েছে বাবা। এত সুন্দর করে সাজিয়েছে যে, দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না মা। কিসের ঘর?'

'ও-মা, ভুলে গেছ! বসার ঘরের ডেকোরেশন বদলানো হল না?'

'ও, আচ্ছা।'

'তোমার তো এটা ভুলে যাবার কথা নয় বাবা! তুমি তো কিছুই ভোল না।'

'এখন মনে হয় কিছু-কিছু ভুলে যাচ্ছি। বয়স হয়ে যাচ্ছে। গেটিং ওল্ড। বসার ঘরটা খুব সুন্দর হয়েছে বুঝি?'

'খুব সুন্দর! এক বার বসার ঘরে ঢুকলে তোমার বেরুতে ইচ্ছা করবে না।'

'তাহলে তো ডেকোরেশন ঠিক হয় নি। বসার ঘর এমন হবে, যেন কেউ বেশিক্ষণ না বসে। যেন খুব অস্বস্তি বোধ করে। চট করে চলে যায়। হা হা হা।'

'বাবা।'

'কি মা?'

'তোমার হাসিটাও কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।'

'কী-রকম লাগছে?'

'মনে হচ্ছে হাসির তেমন জোর নেই।'

'আচ্ছা, দেখ তো এখন কেমন মনে হয়—হা হা হা।'

ফখরুদ্দিন সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রেখে ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখ মুছলেন। তাঁর আরো কয়েকটি কল করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। মনে হচ্ছে শরীর একেবারেই গেছে। দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। দেশের মাটিতে মরতে হবে, এ-রকম কোনো সেন্টিমেন্টাল চিন্তা-ভাবনা তাঁর নেই। এ-রকম চিন্তা-ভাবনা থাকবে বড়-বড় কবি-সাহিত্যিকদের, দেশপ্রেমিক-রাজনীতিবিদদের। তিনি তাঁদের কেউ নন। নিতান্তই এলেবেলে ধরনের এক জন মানুষ। তাঁর কোনো রোমান্টিক চিন্তা-ভাবনা থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু রাতে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তিনি বৃষ্টির শব্দ শুনলেন। ঝম-ঝম বৃষ্টি। আষাঢ় মাসের প্রবল বর্ষণ। তিনি বেল টিপে নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নার্স?'

নার্স অবাক হয়ে বলল, 'কই, না তো!'

'হয়তো হচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছ না। দয়া করে একটু বারান্দায় দেখে আসবে? এ-রকম বৃষ্টি শুধু আমাদের দেশেই হয়। তুমি বোধহয় জান না, আমাদের দেশ হচ্ছে বৃষ্টির দেশ।'

'আমি তো শুনেছিলাম তোমাদের দেশ হচ্ছে অভাবের দেশ।'

'আমাকে দেখে কি খুব অভাবী লোক বলে মনে হচ্ছে?'

'তোমাদের দেশের সবাই তোমার মতো?'

'হ্যাঁ। এখন দয়া করে একটু দেখে এস বৃষ্টি হচ্ছে কি না।'

'বললাম তো, হচ্ছে না।'

'আমি শুনতে পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ না? দয়া করে একটু দেখে এস না! বারান্দায় যেতে তোমার খুব কি কষ্ট হবে?'

'না, হবে না।'

নার্স বারান্দায় গেল না, এক জন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার রুগীর প্রেসার মাপলেন, গায়ের তাপ দেখলেন এবং কড়া সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

লোকাটকে এই বসার ঘরে ঠিক মানাচ্ছে না। রোগা ধরনের অভাবী টাইপের এক জন মানুষ। চোখে মোটা কাচের চশমা। স্যাণ্ডেল ঘরের বাইরে খুলে রেখে এসেছে। সেই স্যাণ্ডেলগুলিরও জরাজীর্ণ অবস্থা। অন্য কেউ হলে ফেলে দিত। এই লোক ফেলতে পারছে না।

এই ঘরে যে লোকটিকে মানাচ্ছে না, তা সে নিজেও বুঝতে পারছে। বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। হাত দু'টি অবসন্ন ভঙ্গিতে কোলের ওপর ফেলে রাখা। গায়ে হলুদ রঙের একটা চাদর। কড়া হলুদ। এই নীল-নীল বসার ঘরে হলুদ রঙ বড় চোখে লাগে। লোকটির বয়স পঞ্চাশের মতো হবে কিংবা তার চেয়ে কমও হতে পারে। অভাবী লোকদের অল্প বয়সেই চেহারা নষ্ট হয়ে যায়।

অপালা পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি এক বার শুধু তাকিয়েছে। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। অথচ অপলা এমন একটি মেয়ে, যার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। অপালা বলল, 'আপনি কি বাবার কাছে এসেছেন?'

লোকটি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। কিন্তু অপালার দিকে তাকাল না। মাথা ঘুরিয়ে জলরঙা ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল।

'বাবা তো দেশে নেই। সপ্তাহখানেক পরে ফিরবেন। আপনি বরং এক সপ্তাহ পরে আসুন।'

'আচ্ছা।'

লোকটি কিন্তু উঠে দাঁড়াল না, বসেই রইল। এইবার সে তাকিয়ে আছে জানালার পর্দার দিকে। যেন পৃথিবীর সমস্ত রহস্য ও সৌন্দর্য জানালার ঐ পর্দাটিতে। অপালা বলল, 'আপনি কি কিছু বলবেন?'

'তোমার মা আছেন?'

অদ্ভুত ব্যাপার তো, এই লোক তাকে তুমি করে বলছে! অপালাকে তুমি করে বলার মতো বাচ্চা এখনো নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে না। তার বয়স একুশ। একুশ বছরের একটি মেয়েকে শাড়ি পরলে অনেকখানি বড় দেখায়। কিংবা কে জানে, লোকটি

হয়তো ভালো করে তাকে লক্ষই করে নি।

'আমার মাও দেশের বাইরে। চিকিৎসার জন্যে গিয়েছেন।'

লোকটি ঠিক আগের মতো ভঙ্গিতে পর্দার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

'আপনার যদি জরুরি কিছু বলার থাকে, আমাকে বলতে পারেন।'

লোকটি হলুদ চাদরের ভেতর থেকে একটা কার্ড বের করল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার বড় মেয়ের বিয়ে ১৭ই পৌষ।'

অপালা হাত বাড়িয়ে কার্ডটি নিল।

'বাবা এলেই আমি তাঁকে দিয়ে দেব। তিনি কি আপনাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ। আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।'

অপালা হাসিমুখে বলল, 'বাবার মন ভালো থাকলে তিনি সাহায্য-টাহায্য করেন। তাঁর কাছে যেতে হয় মুড বুঝে।'

লোকটি উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরোবার সময় হঠাৎ বলে বসল, 'ছেলেটা ভালো পেয়েছি। ব্যাঙ্কে কাজ করে। অগ্রণী ব্যাঙ্ক।'

'বাহ্, খুব ভালো!'

'অফিসার্স গ্রেড। কোয়ার্টার পেয়েছে।'

অপালার বড় মায়া লাগল। সে নিতান্তই অপরিচিত একটি মেয়ে। অথচ এই লোকটি কত আগ্রহ করে তার সৌভাগ্যের কথা বলছে। নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু সাহায্যের জন্যে এসেছিল। লোকটি নিচু গলায় বলল, 'যাই।'

অপালা তার পিছনে-পিছনে বারান্দা পর্যন্ত এল। গেটের বাইরে বার-তের বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে। লোকটি গেট খুলে বেরোতেই এসে তার হাত ধরল। এই মেয়েটি নিশ্চয়ই লোকটির সঙ্গে এসেছে। ভেতরে ঢোকে নি। অপালা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েটি এলেই পারত। বিশাল বাড়ি দেখে হয়তো ভরসা পায় নি। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করেছে বাইরে। ভারি মিষ্টি চেহারা মেয়েটির! লোকটি কেমন—মেয়েটিকে গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে!

'অপা, এই অপা।'

অপালা বিরক্ত মুখে তাকাল। দোতলার গেট থেকে নিশানাথকাকুর স্ত্রী তাকে ডাকছেন। অপালা জবাব দিল না। এই মহিলা গত তিন দিন ধরে এ-বাড়িতে আছেন। প্রথম দিন থেকেই অপালাকে আদর করে অপা ডাকছেন। এই আদর তার সহ্য হচ্ছে না। এক বার ভেবেছির বলবে—আপনি আমাকে অপা ডাকবেন না। বলতে পারে নি। বয়স্ক এক জন মহিলাকে মুখের ওপর এমন কঠিন কথা বলা যায় না। তা ছাড়া ভদ্রমহিলা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন অপালাকে খুশি রাখতে। প্রথম রাতে অপালার ঘরে ঘুমুতে এলেন। অপালা বলল, 'এই ঘরে আপনার ঘুমানোর দরকার নেই।'

'কেন, দু'টা খাট তো আছে!'

'থাকুক। আমার একা-একা থাকতে ভালো লাগে।'

'ও-মা, কেমন কথা! ঘুমুবার আগে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করলে তোমার ভালোই লাগবে মা। আমি খুব মজার-মজার গল্প জানি মা।'

'মজার-মজার গল্প আমার শুনতে ভালো লাগে না।'

'না-শুনেই কী করে বলছ, শুনতে ভালো লাগে না! আচ্ছা, এইটা শোন, তারপর

দেখি না–হেসে থাকতে পার কি না। একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হল কোনটা বেশি দরকারি—চেহারা না ব্রেইন। মেয়েটি বলল, চেহারা। কারণ চেহারা দেখা যায়, ব্রেইন দেখা যায় না। কী, গল্পটা মজার না?'

'হ্যাঁ, মজার।'

'এ–রকম গল্প আমি লক্ষ–লক্ষ জানি।'

অপালা অস্থির হয়ে পড়ল। উঠতে–বসতে একটা হাসির গল্প। কখনো বীরবলের, কখনো গোপাল ভাঁড়ের, কখনো–বা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার।

এই যে ভদ্রমহিলা দোতলার বারান্দা থেকে অপালা–অপালা ডাকছেন, এক্ষুণি তিনি নেমে এসে একটা হাসির গল্প বলবেন, যা শুনে মোটেও হাসি আসবে না। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ম্যানেজারকাকুর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন।

'এই যে অপা।'

'বলুন।'

'কখন থেকে ডাকছি, কথা বলছ না কেন?'

'আমি কথা কম বলি, কাকিমা।'

'এটা ভালো কথা না, মা। কথা বেশি বলবে। হাসবে, খেলবে, গান গাইবে। তুমি দিনরাত এমন গম্ভীর থাক, আমারই ভয় লাগে। ঐ লোকটা কে?'

'কোন লোকটা?'

'ঐ যে, তুমি এগিয়ে দিলে?'

'আমি চিনি না। অচেনা একজন মানুষ।'

'কী সর্বনাশ! তুমি অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলছ কেন?'

'কথা বলা কি নিষেধ? এইসব আপনি কী বলছেন! হাসির গল্প বলতে চান বলুন, এ–রকম অদ্ভুত কথা বলবেন না। আপনিও তো এক জন অচেনা মানুষ। আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলছি না?'

'তুমি শুধু–শুধু আমার উপর রাগ করছ মা। সব জান না, তাই রাগ করছ। কারখানায় বিরাট গণ্ডগোল। দু' জন শ্রমিক মারা গেছে। সবার ধারণা, মালিকপক্ষ মারিয়েছে। এখন প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওরা কিছু করেও বসতে পারে। পারে না?'

অপালা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সে এ–সবের কিছুই জানে না।

'আমি যে মা এখানে আছি, এ–জন্যেই তো আছি।'

'আমাকে তো কেউ কিছু বলে নি!'

'তোমাকে শুধু–শুধু বলবে কেন? আমিও বলতাম না। তুমি রাগ করছ দেখে বললাম।'

'বাবা এ–সব জানেন!'

'জানেন। বড়সাহেবের সঙ্গে গতকাল কথা হয়েছে। বড়সাহেবের শরীর খারাপ, তাই আসতে পারছেন না। শরীর ভালো থাকলে এসে পড়তেন।'

'শরীর খারাপ? কই, আমি তো এই খবরও জানি না!'

'তুমি তো মা কোনো খবরই জান না। কোন দুনিয়ায় তুমি বাস কর বল তো? উদাসীর মতো শুধু ঘুরে বেড়ালে তো হয় না, পৃথিবীর খোঁজখবর রাখতে হয়।'

অপালা একটি কথাও বলল না—তাকিয়ে রইল। ভদ্রমহিলা ঠাণ্ডা গলায় বললেন,

'তোমাকে আরেকটা কথা বলি মা, মন দিয়ে শোন—আমি তোমার মায়ের বয়সী, তোমার মতো মেয়ে আমার ঘরে আছে। আর তুমি এ-রকম কর, যেন আমি রাস্তার একটা মেয়ে।'

ভদ্রমহিলার চেঁচামেচিতে বাসার অন্য সবাই বের হয়ে এল। কী লজ্জার কথা! অপালার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। ইচ্ছে করছে ছুটে বেরিয়ে যেতে। পৃথিবীতে বাস করার এত যন্ত্রণা! আজ সারা দিনে এক পাতাও পড়া হবে না। কী যে হবে পরীক্ষায়, কে জানে!

অপালা তার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দুপুরে ভাত খাবার সময় কাজের মেয়েটি ডাকতে এল। অপালা বলল, 'বিরক্ত করবে না। আমি কিছু খাব না।' বিকেলে চা খাওয়ার জন্যেও নামল না। সন্ধ্যাবেলা নিশানাথবাবু এসে দরজায় টোকা দিলেন। সে খুব স্বাভাবিকভাবে দরজা খুলল। সহজ স্বরে বলল, 'কেমন আছেন ম্যানেজারকাকু।'

'ভালো আছি মা।'

'কারখানায় কী-সব নাকি ঝামেলা?'

'ঝামেলা তো আছেই মা। বিষয়-সম্পত্তি মানেই হচ্ছে ঝামেলা। একমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীরাই ঝামেলামুক্ত।'

'দু' জন নাকি মারা গেছে?'

'হুঁ। নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে মরেছে, দোষ পড়েছে মালিকপক্ষের। তুমি এই নিয়ে কোনো চিন্তা করবে না। আসগর সাহেব চলে এসেছেন, উনি দেখছেন। খুবই কাজের লোক।'

BDeBooks.Com

'আসগর সাহেব কে?'

'আমাদের চিটাগাং ব্রাঞ্চের জি. এম., উনি একতলায় বসে আছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আমার সঙ্গে কিসের কথা?'

'স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। বড় রকমের ডিসিশনের ব্যাপার। তুমি একটু নিচে এস মা।'

আসগর সাহেব মানুষটি সুপুরুষ। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। গোলগাল ভালমানুষের মতো মুখ। কথা থেমে-থেমে বলেন। মনে হয় প্রতিটি শব্দ বলার আগে খানিকক্ষণ ভাবেন। অপালা ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন, এবং অপালা না-বসা পর্যন্ত নিজে বসলেন না।

'খুবই দুঃখিত যে আপনাকে ডিসটার্ব করতে হচ্ছে। মাই অ্যাপোলজি। এদিকে স্যার অসুস্থ, স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।'

'কী বলবেন, বলুন।'

'দু' লাখ টাকার মতো খরচ করলে ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এক লাখ দিতে হবে ইউনিয়নকে। ওদের ঠাণ্ডা করতে হবে। পুলিশকে দিতে হবে বড় এ্যামাউন্ট। তা ছাড়া.....'

ভদ্রলোকের কথার মাঝখানেই অপালা বলল, 'এতে কি মালিকপক্ষের দোষই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে না? সবাই কি তাহলে ভাববে না, এটা আমরাই করিয়েছি?'

আসগর সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমরা যে ধোয়া তুলসীপাতা, তাও কিন্তু না মিস অপালা। ছোট হলেও আমাদের একটা ভূমিকা আছে।'

'অ–আচ্ছা, আছে তাহলে।'

'আপনার সেফটির ব্যাপারটাও দেখতে হয়। আপনার নিরাপত্তা হচ্ছে আমাদের টপ প্রায়োরিটি।'

'আমার নিরাপত্তার ব্যাপারটা আসছে কেন?'

'প্রতিশোধের ব্যাপার আর কি। ধরুন, একটা হাতবোমা এসে ফেলে দিল, অ্যাসিড ছুঁড়ে মারল.....'

অপালা চুপ করে রইল। আসগর সাহেব বললেন, 'আগেও এ–রকম ঝামেলা হয়েছে। টাকাপয়সা দিয়ে মিটমাট করা হয়েছে। অবশ্যি এত বড় স্কেলে ঝামেলা হয় নি। দিস টা.....'

'আপানারা যা ভালো মনে করছেন, তা করাই ভালো।'

'আপনাকে একটা অনুরোধ, এক–একা বাইরে যাবেন না। সবচেয়ে ভালো হয়, প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে না–বেরুলে।'

'আমি এমনিতেই ঘর থেকে বের হই না।'

'ডি.সি. সাউথকে আমি অবশ্যি রিকোয়েস্ট করেছি কয়েক দিনের জন্যে বাড়ির সামনে একটা ফিক্সড সেন্ট্রির ব্যবস্থা করতে। কথায় আছে না, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর? আজ তাহলে উঠি। আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

রাতে অপালা অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল। যেন বিকেল হয়েছে। সূর্য ডুবে যাবার আগের মায়াবী আলো চারদিকে। সে একা–একা বাগানে হাঁটছে। হঠাৎ কে যেন ডাকল—এই..... এই। অপালা চমকে তাকাল—কেউ তো কোথাও নেই! কে ডাকল! অপালা ভয়–পাওয়া গলায় বলল, 'কে ডাকছে আমাকে?'

'আমি। আমি ডাকছি আপনাকে।'

অপালা দেখল, গেটের বাইরে সেই এগার–বার বছরের মেয়েটি দাঁড়িয়ে, যে তার বাবার সঙ্গে ঘরে ঢোকে নি। একা–একা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

'নাম কি তোমার?'

মেয়েটি নাম বলল না। খুব হাসতে লাগল।

'ঐ দিন তুমি ঘরে ঢোক নি কেন? কেন তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে?'

এই প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না মেয়েটি। অপালার বুক কাঁপতে লাগল, কারণ এই মেয়েটিকে তার চেনা–চেনা লাগছে। খুব চেনা—অসম্ভব চেনা। কিন্তু তবুও অচেনা।

এ কেমন স্বপ্ন! ঘুম ভাঙার পরও অপালার হাত–পা কাঁপছে। পানির পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। তার খুব ইচ্ছে করছে চেঁচিয়ে কাঁদে।

ঐ মেয়েটিকে সে কেন স্বপ্নে দেখল? মানুষের অবচেতন মনে কত রহস্যই–না খেলা করে। কোনো দিন মানুষ তা জানতে পারে না। অপালার বড় জানতে ইচ্ছে করে।

হেলেনা ভিজিটার্স রুমে ঢুকে একটু অবাক হলেন।

ফখরুদ্দিন সাহেব বসে আছেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত চুরুট। হেলেনা অবশ্যি তাঁর বিস্ময় গোপন করলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'কেমন আছ?'

'খুব ভালো।'

'চুরুট টানছ? স্মোকিং এখানে নিষিদ্ধ। দেয়ালে লেখা চোখে পড়ে নি?'

'পড়েছে। দেয়ালে লেখা "ধূমপান না করার জন্যে অনুরোধ করছি"। আমি অনুরোধটা রাখলাম না। হা হা হা।'

'তোমার কি শরীর খারাপ?'

'না, শরীর ভালোই আছে।'

'কোথায় ডুব দিয়েছিলে?

'আশেপাশে ছিলাম। তোমরা অবস্থা কি?'

'ভালো।'

'কী-রকম ভালো?'

'বেশ ভালো। অপারেশনটা লাগবে না। ইচ্ছা করলে দেশে ফিরে যেতে পারি।'

'ইচ্ছা করছে?'

হেলেনা জবাব দিলেন না। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'এই মুহূর্তে দেশে ফিরতে পারছি না। এখানে আমার কিছু কাজ আছে। কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'ক'দিন লাগবে কাজ শেষ হতে?'

'দিন দশেক লাগবে।'

'কি কাজ?'

ফখরুদ্দিন সাহেব এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ডাক্তাররা তাঁর শরীরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চায়। দিন দশেক সময় এই কারণেই তারা চাচ্ছে। হেলেনাকে তা বলার তিনি কোনো প্রয়োজন বোধ করছেন না। আজ যে হাসপাতাল থেকে বের হয়েছেন, সেও বহু কষ্টে। বলে এসেছেন দু' ঘন্টার মধ্যে ফিরবেন। তাও সম্ভব হবে কি না কে জানে? দু' ঘন্টার এক ঘন্টা তো এখনই শেষ।

'হেলেনা।'

'বল।'

'চল, একটু হেঁটে আসি।'

'কোথায় হাঁটবে?'

'এই বাগানেই হাঁটব। বেশি দূর যাব না। তোমার হাঁটহাঁটিতে কোনো বাধা নেই তো?'

'না, নেই।'

'গুড। গায়ে ওভারকোট জাতীয় কিছু-একটা চাপিয়ে এস।'

ছবির মতো সুন্দর বাগান। এত সুন্দর যে কৃত্রিম মনে হয়। বড় বেশি সাজানো।

ফখরুদ্দিন সাহেব মাঝে-মাঝে কাশছেন, কিন্তু কোনো কথা বলছেন না। হেলেনা হঠাৎ বললেন, 'তুমি যে খুব অসুস্থ, একটা হাসপাতালে আছ, এই খবর কিন্তু আমি জানি।'

'জানলে তো ভালোই।'

'অন্যের কাছ থেকে জানতে হল।'

ফখরুদ্দিন সাহেবের চুরুট নিভে গিয়েছিল; অনেক কায়দা করে সেটা ধরাতে হল। তিনি কিছু বললেন না।

'আমাকে খবরটা না-জানানোর পিছনে তোমার যুক্তিগুলি কি, একটু বল তো শুনি।'

'কোনো যুক্তি নেই। এস, কোথাও একটু বসা যাক। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।'

তাঁরা বসলেন। হেলেনা মৃদু স্বরে বললেন, 'এখনো কি তুমি বিশ্বাস কর, টাকা দিয়ে সব পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, করি।'

'মানুষ হিসেবে তুমি কি সুখী?'

'হ্যা, সুখী। তোমার মতো বানানো দুঃখ-কষ্ট আমার নেই। আমার বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের। আমার মতো মানুষের কোনো কাল্পনিক দুঃখ-কষ্ট থাকে না। ঐ সব থাকে খুব উচ্চমার্গের লোকদের।'

'আমার কিন্তু ধারণা, তুমি খুব দুঃখী মানুষ।'

'তাই নাকি? ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

'তুমি যে খুব দুঃখী, এটা তুমি নিজেও জান।'

ফখরুদ্দিন সাহেব চুরুটটা ছুঁড়ে ফেললেন। ঢালু জায়গা পেয়ে চুরুটটা গড়াতে-গড়াতে নিচে নামছে। সেই দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতের মতো তাঁর মাথায় এল, মানুষের জীবনও কি এ-রকম গড়িয়ে যাওয়া নয়? কেউ কিছু দূর গিয়েই আটকে যায়, আবার কেউ যেতেই থাকে। এমন কিছু উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক চিন্তা নয়, তবু ফখরুদ্দিন সাহেবের বেশ ভালো লাগছে। তিনি পকেট থেকে আরেকটি চুরুট বের করে গড়িয়ে দিলেন। হেলেনা বললেন, ' কি করছ?'

'এক ধরনের খেলা, তুমি বুঝবে না।'

'না-বোঝারই কথা। তোমার বেশির ভাগ কাজকর্মই আমি বুঝি না।'

'তুমি কি করে বুঝবে বল, আমি নিজেই বুঝি না।'

বলতে-বলতে ফখরুদ্দিন সাহেব খুব হাসলেন। হাসতে-হাসতে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। হেলেনা বললেন, 'তোমার অসুখটা কী?'

'জানি না, কি। ডাক্তাররা জানার চেষ্টা করছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, ডাক্তাররা খুঁজে-খুঁজে একটা খারাপ অসুখই বের করবে। রাজকীয় কোনো অসুখ। ডায়রিয়া বা আমাশার মতো অসুখে আমাকে মানাবে না ; এইসব হচ্ছে ভিখিরিদের অসুখ। আমি কি ভিখিরি? হা হা হা।'

লণ্ডনের আকাশ আজ ঘন নীল। বাতাস মধুর। রোদের রঙ কাঁচা সোনার মতো। অদ্ভুত সুন্দর একটি দিন। ফখরুদ্দিন সাহেব এমন চমৎকার একটি দিনেও খানিকটা

বিষণ্ণ হলেন। সুনীল আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হেলেনা বললেন, 'আজ তুমি অপালার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলো।'

'কেন বল তো?'

'ওর বোধহয় খুব মন-খারাপ। কী-একটা দুঃস্বপ্ন দেখে খুব কেঁদেছে। আমাকে বলতে-বলতেও কাঁদল।'

'কী দুঃস্বপ্ন?'

'একটা ছোট্ট মেয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, এইসব কি হাবিজাবি।'

'দুঃস্বপ্নটা কী, তা তো বুঝলাম না। রাক্ষস-খোক্কস স্বপ্নে দেখলেও না-হয় কথা ছিল। ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো কী হয়েছে?'

হেলেনা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মাঝে-মাঝে সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন দেখেও মানুষ ভয় পায়। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে।'

'আমি এক্ষুণি টেলিফোন করছি।'

'ফখরুদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ফিরোজের দুপুরে ঘুমানোর অভ্যেস নেই।

তার ধারণা গৃহী টাইপের মহিলা এবং ডায়াবেটিক প্রৌঢ়রাই নিয়ম করে দুপুরে ঘুমায়। এক জন ইয়াংম্যান, যার রক্তে উত্তেজনা টলমল করছে, তার দুপুরে ঘুমানোর প্রশ্নই ওঠে না। ফিরোজের ধারণা, সে নিজে এক জন ইয়াংম্যান এবং তার রক্তে উত্তেজনা টলমল করছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এইসব ধারণা থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক দিন ধরে তাকে নিয়মিত ঘুমুতে দেখা যাচ্ছে। মশারি খাটিয়ে বেশ একটা আয়োজনের ঘুম।

মশারি খাটানোর কারণ হচ্ছে, এ-বাড়ির মশারা দিন এবং রাত্রির পার্থক্য বোঝে না। এরা দিনে বেশি কামড়ায়।

দুপুরে ঘুমানোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, ঘুম ভাঙলেই বিচিত্র কারণে মন স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে। কোনো কিছুই ভালো লাগে না। মন-খারাপ ভাব কিছুতেই কাটতে চায় না। ফিরোজের ধারণা, বেশির ভাগ যুবক আত্মহত্যা করে দুপুরে ঘুমের পর। একটি উদাহরণ তার কাছে আছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সমু, এক দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে উঠল। চায়ের দোকানে চা খেয়ে এসে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখল। সেই চিঠিতে কোনো সম্বোধন নেই, কাজেই বোঝা গেল না কাকে লেখা। চিঠি শেষ করে তাদের তিনতলার ছাদ থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল।

দুপুরবেলায় ঘুমুলে ফিরোজেরও এ-রকম নাটকীয় কিছু করতে ইচ্ছে করে। এই মুহূর্তেই করছে। সে বারান্দায় কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটল, তারপর ঠিক করল অপালা মেয়েটির সঙ্গে এক কাপ চা খাবে। সে-বাড়িতে যাবার জন্যে একটা অজুহাত ভেবে-চিন্তে বের করতে হবে। সেটা যে এখনই বের করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। পথে যেতে-যেতে ভাবলেই হবে।

এই মেয়েটি তাকে এত ভোগাচ্ছে কেন? রোজ খানিকক্ষণের জন্যে হলেও এর কথা মনে পড়ে। এটা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। আসল কথা হল, কেন বার-বার মনে পড়ছে?

মেয়েটি রূপবতী! এটা এমন কোনো ব্যাপার নয়। এ-শহরে প্রচুর রূপবতী মেয়ে আছে। এদের কারো-কারো সঙ্গে তার পরিচয়ও আছে। কই, ওদের কথা তো মনে পড়ে না!

মেয়েটির মধ্যে রহস্য আছে! সে তো সব মেয়ের মধ্যেই আছে। মেয়ে মানেই তো রহস্য। আনসলভ্‌ড্‌ মিস্ট্রি।

মেয়েটি অন্য কোনো মেয়ের মতো নয়। এটা কোনো কথা হল না। কোনো মেয়েই অন্য কোনো মেয়ের মতো নয়। প্রতিটি মেয়েই আলাদা।

ফ্রয়েডীয় তাত্ত্বিকদের মতো চিন্তা করা যাক। এই মেয়েটির চেহারা বা আচার-আচরণে কোথাও ফিরোজের মা'র সঙ্গে মিল আছে। মায়ের সঙ্গে মিল আছে এই জাতীয় মেয়ের প্রতি পুরুষেরা প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করে। বোগাস কথা! ফিরোজের মা ফিরোজের জন্মের সময় মারা যান। সেই মহিলার কোনো স্মৃতি ফিরোজের মনে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

মেয়েটির প্রচুর টাকাপয়সা—এটা কি একটা কারণ হতে পারে? না, হতে পারে না। টাকার লোভ ফিরোজের আছে, তবে তা নিশ্চয়ই খুব প্রবল নয়। প্রবল হলে সিনেমার কাজ ছেড়ে দিত না। মোটামুটি ভালো টাকাপয়সার একটা সম্ভাবনা ঐ লাইনে ছিল।

অপালাদের বাড়ির সামনে এক জন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। এর মানে কী? মেয়েটির বাবা কি মন্ত্রী-ফন্ত্রী হয়ে গেলেন নাকি? পয়সাওয়ালা লোকজন হঠাৎ করে মন্ত্রী হয়ে যান। ইনিও হয়তো হয়েছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী কিংবা পাটমন্ত্রী। আচ্ছা, দেশে পাটমন্ত্রী আছে, চা-মন্ত্রী নেই কেন?

রপ্তানিযোগ্য প্রতিটি আইটেমের ওপর এক জন করে মন্ত্রী থাকলে ভালো হত। চামড়া-মন্ত্রী, রেডিমেড গার্মেন্ট-মন্ত্রী, চিংড়ি-মন্ত্রী। সবচেয়ে ভালো হয় এক জন ব্যাঙ-মন্ত্রী থাকলে। ব্যাঙও তো আজকাল রপ্তানি হচ্ছে। তবে এই দপ্তর হয়তো কেউ নিতে চাইবেন না। কে আর শখ করে ব্যাঙ-মন্ত্রী হবে?

অপালাদের গেটে বিশাল এক তালা, এ-ও রহস্যজনক। দিনে-দুপুরে গেটে তালা থাকবে কেন? দারোয়ান ব্যাটা টুলে বসে আছে। ফিরোজকে দেখেও সে বসে রইল। এটাই স্বাভাবিক। সে যদি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বসত, তাহলেই অস্বাভাবিক হত।

'এই যে দারোয়ান, গেটটা খোল।'

দারোয়ান তাকে ভালোই চেনে। ফিরোজ বেশ কিছুদিন এ-বাড়িতে কাজ করেছে, তাকে না-চেনার কোনোই কারণ নেই। দেখা হয়েছে দু' বেলা। তবু এই ব্যাটা এমন করে তাকাচ্ছে, যেন ফিরোজ খুনের পলাতক আসামী—এই বাড়িতে আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে।

'আফনে কার কাছে যাইবেন?'

'তোমাদের আপার কাছে। উনিই আসতে বলেছেন।'

'দাঁড়ান, খবর দেই।'

দারোয়ান গেট খুলল না। খবর দেবার জন্যে রওনা হল। গদাইলস্করি চাল বোধহয় একেই বলে। দশ মিনিট পর-পর একেকটা পা ফেলছে। এভাবে হাঁটলে বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছতে-পৌঁছতে রাত এগারটা বাজবে।

ফিরোজ অতি দ্রুত এ-বাড়িতে উপস্থিত হবার অজুহাত মনে-মনে সাজিয়ে ফেলতে চেষ্টা করল। সেই সঙ্গে কী কথাবার্তা হবে, তা নিয়ে একটা স্টেজ রিহার্সল। "মেয়েটি এসেছে। মুখ হাসি-হাসি। ফিরোজ বলছে—হঠাৎ এসে বিরক্ত করলাম। মেয়েটি বলল—না না, বিরক্ত কিসের, এসেছেন খুশিই হয়েছি। আসুন, একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে। খুব লোনলি ফিল করছিলাম। অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট, মনে হচ্ছিল আপনি আসবেন।

'আমার বিয়েটা ভেঙে গেল, ঐ খবরটা দিতে এসেছিলাম'

'বিয়ে ভেঙে গেল নাকি?'

'হ্যাঁ। মেয়ের আমেরিকা প্রবাসী চাচা আমাকে পছন্দ করলেন না।'

'মেয়ের চাচার পছন্দে কী যায়-আসে? মেয়ে তো আপনাকে পছন্দ করেছে।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। এখন দেখছি সেটা ঠিক না। ভীষণ মন-খারাপ হয়ে গেছে। সারা দুপুর শুয়ে-শুয়ে স্যুইসাইড করার কথা ভাবলাম। এখন যে ভাবছি না, তা নয়। এখনো ভাবছি।'

'ছিঃ, এ-সব ভাবনা মনেও আনবেন না। আমার এখানে এসেছেন ভালো করেছেন, গল্প করে মন হালকা করুন।....."

চিন্তা এই পর্যন্ত এসে কেটে গেল। দারোয়ান গদাইলস্করি চালে ফেরত আসছে। ব্যাটার মুখ অন্ধকার। নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে দাবড়ানি খেয়েছে।

'আপা কী বলল?'

'আফনেরে চইল্যা যাইতে কইছে।'

'চলে যেতে বলেছে?'

'জ্বি।'

'আমার কথা বলেছিলে ঠিকমতো?'

'জ্বি, বলছি।'

'কী বলেছ?'

'বলছি, ঐ যে ভদ্রলোক ঘর সাজাইয়া দিছে হে আসছে .....'

'আর তোমার আপা কী বলল?'

'এক কথা কয়বার কমু, কন। চইল্যা যাইতে কইছে।'

ফিরোজ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। হাত কেঁপে যাচ্ছে। পাশে দাঁড়ানো পুলিশটি সহানুভূতির চোখে তাকাচ্ছে। খাকি পোশাক-পরা কেউ সহানুভূতি দেখাতে পারে, এটা ফিরোজের কল্পনায় ছিল না। সে কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। ছুটে পালিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভালো হত। তা করা যাচ্ছে না। তাকে হেঁটে-হেঁটে সদর রাস্তা পর্যন্ত যেতে হবে, এবং যতক্ষণ তাকে

দেখা যাবে ততক্ষণ পুলিশ এবং দারোয়ান তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের চোখে থাকবে সহানুভূতি ও করুণা।

ফিরোজ মাথা নিচু করে পা বাড়াল। হাতের সিগারেটটি নিভে গেছে। আবার ধরাতে ইচ্ছে করছে না। কোথায় এখন যাওয়া যায়? যাবার তেমন কোনো জায়গা নেই। তাজিন আপার কাছে যাওয়া যেতে পারে। অনেক দিন যাওয়া হয় না। মনসুরের বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ ওকে বিরক্ত করা যেতে পারে। নতুন বিয়ে করেছে। সন্ধ্যার পর কেউ বেড়াতে গেলে অসম্ভব বিরক্ত হয়। মুখ হাঁড়ির মতো করে রাখে, একটু পর-পর ঘড়ির দিকে তাকায়, রাত আটটা বাজতেই লোক-দেখানো হাই তুলতে শুরু করে।

মনসুরের ওখানেও যেতে ইচ্ছে করছে না। আজ সারারাত পথে-পথে হাঁটলে কেমন হয়? এই পাগলামির বয়স কি তার আছে?

ফিরোজের ঠাণ্ডা লাগছে। ইচ্ছে করেই আজও পাতলা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে এসেছিল। যদি অপালা পাতলা শার্ট নিয়ে ঐ দিনের মতো কিছু বলে!

ফিরোজ অনেক রাত পর্যন্ত পাতলা জামা গায়ে দিয়ে শহরে ঘুরে বেড়াল। এক সময় তার মাথা ভারি হয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশপাতাল জ্বর আসবে। আসুক। পেতেছি সমুদ্রে শয্যা শিশিরে কি ভয়?

রান্নাঘরে নিশানাথবাবুর স্ত্রী। চারদিকে বাসনপত্র ছড়িয়ে কী-সব যেন করছেন। বাবুর্চি গোমেজ, চোখমুখ কুঁচকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। গোমেজ এই মহিলাটিকে পছন্দ করছে না। এই মহিলা সরাসরি তার সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করছে। যখন-তখন রান্নাঘরে ঢুকে জিনিসপত্র এলোমেলো করে দিচ্ছে। এখন আর কোনো কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না। গতকাল লবণের কৌটা খুঁজতে তার দশ মিনিট লেগেছে। অথচ লবণের কৌটা থাকে দ্বিতীয় তাকের সবচেয়ে প্রথমে। আগে চোখ বন্ধ করে বের করতে পারত।

'গোমেজ।'

'জ্বি।'

'দেখছ কী তুমি? ব্যাটাছেলের রান্নাঘরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা বড় খারাপ লাগে।'

'আমার কাজই তো রান্নাঘরে!'

'ও, আচ্ছা। তাই তো, মনে থাকে না। তুমি রান্না শিখেছ কার কাছে?'

গোমেজ জবাব দিল না। ভদ্রমহিলা চালের গুঁড়োয় পানি ছিটাতে-ছিটাতে বললেন, 'বাঙালি রান্না কিছু জান, না শুধু সাহেবি রান্না?'

এই প্রশ্নেরও সে জবাব দিল না। কঠিন মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই মহিলাটি বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে।

'গোমেজ, তুমি যাও তো, অপালাকে ডেকে নিয়ে এস। বল, ভাপা পিঠা বানাচ্ছি, সে যেন দেখে যায়। তাকে শিখিয়ে দেব।'

'আমি রান্না ছাড়া অন্য কাজ করি না।'

'এটা কেমন কথা! তুমি ডেকেও আনতে পারবে না?'

'জ্বি–না। তা ছাড়া আমাদের দোতলায় যাওয়া নিষেধ আছে। শুধু রমিলা দোতলায় যেতে পারে।'

'এইসব নিয়ম–কানুন কে করেছে?

'বড়সাহেব।'

'বড়সাহেব তো এখন নেই, তুমি যাও ডেকে নিয়ে এস। এ–রকম হাবার মতো দাঁড়িয়ে থেকো না।'

গোমেজ বের হয়ে এল, কিন্তু দোতলায় উঠল না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল। গোমেজের ঘর মূল বাড়ির দক্ষিণে আলাদা দু'টি কামরা। একটিতে শোবার ব্যবস্থা, অন্যটিতে রান্নার। এ–বাড়ির মোট আট জন কাজের লোকের জন্যে আলাদা রান্না হয়। সেই রান্নাও গোমেজ করে। গোমেজ ঠিক করল আজ সে কোনো রান্নাবান্না করবে না। তার এ–রকম অভ্যেস আছে। মাঝে–মাঝে মেজাজ বিগড়ে গেলে এ–রকম করে। রান্না তো শুধু হাঁড়িতে কিছু জিনিস ফেলে নাড়াচাড়া করা নয়। এটা খুব কঠিন ব্যাপার। মন বসাতে হয়। তা সবসময় সম্ভব হয় না। আজ যেমন হবে না। আজ সে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে। গোপনে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করবে। এই অভ্যেসও তার পুরনো।

নিশানাথবাবুর স্ত্রী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই অপালার খোঁজে গেলেন। মেয়েটি তাঁকে পছন্দ করে না, কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড মায়া পড়ে গেছে। পাগলা–পাগলা ধরনের মেয়ে। একা–একা থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে।

'অপা, কি করছ তুমি?'

'পড়ছি কাকিমা, আজ আমার ফিফ্‌থ্‌ পেপার পরীক্ষা।'

'ও–মা! কই, আমি তো জানি না।'

'আপনি জানবেন কেন? আপনার তো জানার কথা নয়।'

'পরীক্ষা কখন?'

'বিকেলে দু'টার সময় আরম্ভ হবে, শেষ হবে পাঁচটায়।'

'তাহলে তো তোমার দুপুরের খাবার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে হয়।'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না কাকিমা, পরীক্ষার আগে আমার খুব টেনশান থাকে, আমি কিছু খেতে পারি না।'

'সে কী কথা! কিছুই খাবে না?'

'একটু চা খাব , একটা স্যাণ্ডউইচ খাব। ঐ নিয়ে আপনি ভাববেন না।'

'দৈ আছে কি না ঘরে, কে জানে। দৈ খেলে পেটটা ঠাণ্ডা থাকবে। দাঁড়াও, আমি দৈয়ের ব্যবস্থা করছি। ঘরে–পাতা দৈ। তোমার ম্যানেজারকাকু ঘরে–পাতা দৈ ছাড়া খেতে পারে না।'

'আপনাকে কোনো ঝামেলা করতে হবে না।'

'ঝামেলা কিচ্ছু না। যাব আর নিয়ে আসব। গাড়ি তো আছেই।'

অপালা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যখন বেরুচ্ছেন, তখন একটা কাজ করতে পারবেন?'

'পারব না মানে! কী কাজ?'

'দামি একটা শাড়ি কিনে আনতে পারবেন? যেন খুব ভালো হয়।'

'তোমার জন্যে।'

'না, আমার জন্যে না। আমি একজনকে উপহার দেব?'

'কাকে?'

অপালা মনে-মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই মহিলাকে কিছু বলাই বোকামি। এক লক্ষ প্রশ্ন করবে। বিরক্ত করে মারবে।

'কাকে দেবে শাড়ি?'

'এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। ভদ্রলোককে আমি চিনি না। খুব আগ্রহ করে দাওয়াত দিয়েছেন। খুব মায়া লেগেছে। তা ছাড়া বাবা এখানে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু-একটা দিতেন।'

'উনি যখন নেই, তখন তোমার এত মাথাব্যথা কেন?'

'আপনি না-পারলে ম্যানেজারকাকুকে বলুন।'

'পারব না কেন? কত টাকার মধ্যে কিনব?'

'আগেই তো বলেছি, দামি একটা শাড়ি।'

'একেক জনের দামি তো একেক রকম মা। আমার কাছে তো তিন শ' টাকা দামের শাড়িই মনে হয় অনেক দামি।'

'আপনি পছন্দ করে কিনুন। আর কাকিমা, এখন যান। আমি পড়ছি, একটা চ্যাপ্টার এখনো বাকি।'

'মেয়েটা কেমন, ফর্সা না কালো? শাড়ি তো সেইভাবেই কিনতে হবে।

'আমি মেয়েটাকে দেখি নি। বাঙালি মেয়ে যে-রকম হয়, সে-রকম হবে। খুব বেশি ফর্সা নয়, কালোও নয়। কাকিমা, আপনি এখন যান।'

'ভাপা পিঠা খাবে? ভাপা পিঠা বানাচ্ছি।'

'আমি এখন কিচ্ছু খাব না।'

আজ অপালার ফিফ্‌থ্ পেপার। এই পেপারেই তার প্রিপারেশন সবচেয়ে কম। পরীক্ষা খুব খারাপ হবে। একটা চ্যাপ্টার এখনো পুরো বাকি। পরীক্ষার ঠিক আগে-আগে পড়বে ভেবেছিল, যাতে মনে থাকে, এলোমেলো না-হয়ে যায়। কিন্তু সকাল থেকেই একটার পর একটা ঝামেলা। বই নিয়ে বসার সঙ্গে-সঙ্গে একটা মেয়ে ফোন করল। অপালা 'হ্যালো' বলামাত্র একনাগাড়ে কথা বলতে লাগল-নমিতা, আজ কী হয়েছে শোন্। ভাই, আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। এত অপমানিত হয়েছি! আমি আমার জীবনে এত অপমানিত হই নি—বিশ্বাস কর্, এক ঘন্টা কেঁদেছি। রিকশায় কাঁদতে-কাঁদতে এসেছি। রাস্তার সমস্ত লোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। রিকশাওয়ালা পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখেছে.....

অপালা বলবার সুযোগই পেল না যে এটা রং নাম্বার, আর তার নাম নমিতা নয়। মেয়েটা নিজের কথা বলতে-বলতে ফোঁপাতে শুরু করল। কী অস্বস্তিকর অবস্থা! অপালা বলল, 'শুনুন, আমার নাম নমিতা নয়। আপনার রং নাম্বার হয়েছে।'

ফোনের ও-পাশে মেয়েটি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম অপালা।'

'ও, আচ্ছা। আপনি আমার এইসব কথা কাউকে বলবেন না, প্লীজ।'

কী অদ্ভুত কথা! অপালা কাকে এ-সব কথা বলবে? আর বললেই-বা কী? কে চিনবে এই মেয়েকে?

ফোন রেখে বই নিয়ে বসেও মেয়েটির কথা মনে হতে লাগল। বইয়ে মন বসছে না। পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু পড়াটা মনে ধরছে না। তখন টঙ্গির কারখানা থেকে টেলিফোন। মিজান বলে কে এক লোক! সুপারভাইজার। তাকে অপালা কোনো দিন চোখেও দেখে নি। লোকটি তাকে ম্যাডাম ডাকছে। অপালা কঠিন স্বরে বলল, 'আমাকে ফোন করেছেন কেন? আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

'ম্যাডাম, একটা খুব বড় ঝামেলা হয়েছে।'

'কি ঝামেলা?'

'অফিসার লেভেলের সবাইকে শ্রমিকরা একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিয়েছে। ঘেরাও।'

'আমাকে এটা জানাচ্ছেন কেন? আমি কী করব?'

'না, মানে, আপনার কিছু করার নেই। আমরা পুলিশে খবর দিয়েছি। শুধু আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।'

'আমাকে জানিয়ে রাখার কোনো দরকার নেই। প্লীজ, আমাকে শুধু-শুধু বিরক্ত করবেন না।'

'ম্যাডাম, ভেরি সরি।'

অপালা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। এত ঝামেলা নিয়ে কিছু করা যায়? বারটা পর্যন্ত একনাগাড়ে পড়বে ভেবেছিল সে। এগারটা বাজতেই উঠে পড়ল। বাগানে রোদে খানিকক্ষণ হাঁটল। মালী বলল, 'ফুল দেব আপা?' বলেই সে অপেক্ষা করল না, বিরাট বড় একটা গোলাপ ছিঁড়ে দিল। এত সুন্দর একটা গোলাপ হাতে নিলে কেমন মন-খারাপ হয়ে যায়।

'আরো দেব আপা?'

'না, আর লাগবে না।'

অপালা গোলাপ হাতে নিয়ে বাগানে হাঁটছে। অরুণা এবং বরুণা অলস পায়ে তার পিছনে-পিছনে হাঁটছে। শীতের দিনের ঝকঝকে সোনালি রোদে এদের তিন জনকে চমৎকার লাগছে। মালী কাজ ভুলে এদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ফিরোজের জ্বর তৃতীয় দিনে নেমে গেল। তার ধারণা হয়েছিল ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া এইসব কিছু-একটা হয়েছে। তা নয়, ঠাণ্ডা লেগেছিল। তা তাকে তেমন কাবু করতে পারল না। এই তো আজ বেশ উঠে বসতে পারছে। সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। সিগারেটের তৃষ্ণা হবার মানে——রোগ সেরে গেছে। সে সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে নিচে নেমে গেল।

হাজি সাহেব নিড়ানি হাতে বাগানে। ফুলের বাগান নয়, টমেটো গাছ লাগিয়েছিলেন। বাজারভর্তি পাকা টমেটো, কিন্তু হাজি সাহেবের গাছে সবে ফুল ফুটছে।

ফিরোজের ধারণা, অতিরিক্ত যত্নের কারণে এই অবস্থা।

'হাজি সাহেব, কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনার জ্বর সেরে গেছে নাকি?'

'পুরোপুরি সারে নি। সারব-সারব করছে। আপনার গাছে ফুল ফুটেছে দেখছি! মিরাকল করে ফেলেছেন!'

'ফুল পর্যন্তই, ফল হয় না। ফুল ফোটে, দু'দিন পর ঝরে যায়। আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'কোথাও না, রাস্তায়।'

'চা খাবেন?'

'না।'

'ঐ ব্যাপারটা কিছু করেছেন?'

'আপনার মেয়ের কথা বলছেন?'

'জ্বি।'

'জ্বরে আটকা পড়ে সব জট পাকিয়ে গেছে। দেখি, কাল-পরশুর মধ্যে বেরুব।'

হাজি সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'আরেকটা সম্বন্ধ এসেছে।'

'বলেন কী! ছেলে কী করে?'

'করে না কিছু। ক্যাশ টাকা পেলে বিজনেস করবে বলছে।'

'ক্যাশ টাকা কে দেবে, আপনি?'

'আমি ছাড়া আর কে?'

'একেবারেই পাত্তা দেবেন না। নেক্স্ট টাইম যখন আসবে, এক চড় দিয়ে বিদায় করে দেবেন। আমি তো ব্যবস্থা করছিই। আমি কি বসে আছি নাকি? ভাবেন কী আমাকে? কথা দিয়েছি না? কথার একটা দাম আছে না?'

হাজি সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি খুব-একটা ভরসা পাচ্ছেন না।

'ঐ লোক এলে হাঁকিয়ে দেবেন, বুঝলেন? ব্যাটা আছে টাকার তালে। এদের ধরে-ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া দরকার, তাহলে বিয়ের শখ ঘুচে যাবে।'

রাস্তায় নেমে ফিরোজের মনে হল জ্বর আবার চেপে আসছে। রোদ চোখে লাগছে। মাথা হালকা মনে হচ্ছে। সিগারেটে টান দিয়ে মনে হল এক্ষুণি বমি করে সব ভাসাবে। পেটের ভেতর ক্রমাগত পাক দিচ্ছে। কী ভয়াবহ অবস্থা। দু' টাকা দিয়ে কেনা বেনসন এ্যাণ্ড হেজেস। শুধুমাত্র মহাপুরুষরাই একটান দিয়ে দু' টাকা দামের সিগারেট ফেলে দিতে পারেন। ফিরোজ মহাপুরুষ নয়, মহাপুরুষ হবার কোনো আগ্রহও তার নেই। সে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে এলোমেলো পা ফেলতে লাগল।

'আপনি এখানে কী করছেন?'

ফিরোজ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে জ্বরের ঘোরে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। কারণ সে যে-দৃশ্যটি দেখছে, তা তার এই অবস্থায় দেখতে পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বাংলা সিনেমাতেও এই ঘটনাটাকে নাটকীয় মনে হবে।

'আপনি কি আমকে চিনতে পারছেন না?'

'চিনতে পারব না কেন? আপনি, এক জন অসম্ভব রাগী হৃদয়হীন অহঙ্কারী তরুণী। এখানে কী করছেন?'

অপালা হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতেই বলল, 'বেশ কিছুক্ষণ থেকে আপনাকে লক্ষ করছি। এ-রকম পাগলের মতো পা ফেলছেন কেন? আপনি কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ। তার আগে বলুন, এমন সহজ ভঙ্গিতে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন কেন? ঐ দিন এমন অপমান করলেন। নেহায়েত সাহসের অভাবে সুইসাইড করি নি।

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কিসের অপমান?'

'ঐ যে ঐ দিন দেখা করতে গেলাম, আপনি বলে পাঠালেন দেখা হবে না।'

'ঐ দিন মন ভালো ছিল না। কথা বলতে ভালো লাগছিল না। এতে অপমান বোধ করার কী আছে?'

'আজ কি আপনার মন ভালো?'

'হ্যাঁ, ভালো। গতকাল আমার একটা পরীক্ষা ছিল। খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছি।'

'এখানে কী করছেন?'

'এক জনকে খুঁজছি।'

'আমাকে না তো?'

'না, আপনাকে কেন খুঁজব? এ-রকম করে কথা বলছেন কেন?'

'শরীর খারাপ তো, কাজেই উল্টোপাল্টা কথা বলছি। ঐ-সব ধরবেন না। আপনি এক-একা হাঁটছেন, আপনার বডিগার্ডরা কোথায়? গাড়ি কোথায়?'

অপালা হাসতে-হাসতে বলল, 'কাউকে না-বলে একা-একা বেরিয়েছি। এক জনকে একটা গিফ্‌ট্ দেব। ঠিকানা লেখা আছে, খুঁজে বের করতে পারছি না।'

'দিন ঠিকানা, এক্ষুণি বের করে দিচ্ছি।'

'এইভাবে লুঙ্গি পরে যাবেন? আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, আপনি চট করে কাপড় বদলে আসুন।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে না-থেকে আপনিও বরং আমার সঙ্গে আসুন। কোথায় কীভাবে থাকি দেখে যান, কাজে লাগবে।'

'কী কাজে লাগবে?'

'বাংলাদেশে কিছু দরিদ্র মানুষও থাকে, এটা জানবেন।'

'আপনার ধারণা, আমি জানি না?'

'আমার সে-রকমই ধারণা।'

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, শাড়ির প্যাকেট হাতে অপালা ফিরোজের পিছনে-পিছনে আসছে। অপালার ভালোই লাগছে। কেন ভালো লাগছে তাও ঠিক বুঝতে পারছে না। এই মানুষটি তাকে দেখে অসম্ভব খুশি হয়েছে। তা ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে, কথা বলার ভঙ্গিতে। তার সিগারেটে আগুন নেই। সেই নেভানো সিগারেটই সে টানছে এবং ধোঁয়া ছাড়বার মতো ভঙ্গি করছে। লোকটি জানে না যে তার সিগারেট নেভানো। অপালার মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ খেলা করছে। এই সন্দেহটিকে প্রশ্রয় দেয়া বোধহয় ঠিক হবে না।

ফিরোজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্মিত গলায় বলল, 'আপনি সত্যি-সত্যি আমার সঙ্গে আসছেন!'

'আপনি তো আসতে বললেন।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো। কথার কথা হিসেবে বলেছিলাম, সত্যি-সত্যি চলে আসবেন ভাবি নি। আপনি কি রোমান হলিডে নামের কোনো ছবি দেখেছেন?'

'না। কেন?'

'যে-ঘটনাটা আমার জীবনে ঘটছে, তার সঙ্গে ঐ ছবিটার অদ্ভুত মিল আছে। ঐ ছবিতে একজন রানী এক দিন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, সারাটা দিন কাটান এক জন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলা আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।'

'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন কেন?'

'আগেই তো বলেছি, আমি অসুস্থ, আমার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। যা মনে আসছে বলে ফেলছি। আপনি চলে যাবার আগে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইব। সাবধানে উঠবেন, সিঁড়িটা পিছল।'

ফিরোজ অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটা কী সুন্দর গুট-গুট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে! তার মনে হল, মেয়েটির মাথাও খানিকটা এলোমেলো। কিংবা লোকজনের সঙ্গে মিশে তার অভ্যেস নেই। সাধারণ একটি মেয়ে কখনো কোনো অবস্থাতেই এমন পরিচয়ে তার ঘরে আসবে না। ব্যাপারটির অস্বাভাবিকতা মেয়েটির চোখেই পড়ছে না, কিংবা কে জানে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, এটা স্বপ্নদৃশ্য নয় তো? সমস্ত ব্যাপারটা হয়তো স্বপ্নে ঘটে যাচ্ছে। না, তা নয়। ফিরোজ সেন্টের গন্ধ পাচ্ছে। ঘন নীল রঙের আকাশ দেখতে পাচ্ছে। স্বপ্ন হয় গন্ধ ও বর্ণহীন।

অপালা কৌতূহলী হয়ে দেখছে। দেখার মতো কিছু নেই। অপরিচ্ছন্ন নোংরা একটি ঘর। অন্য দিন এর চেয়ে পরিষ্কার থাকে। অসুস্থ থাকার কারণে কোনো কিছুতেই হাত দেয়া হয় নি। এখনো মশারি খাটানো। মেঝেতে সিগারেটের টুকরো। ময়লা কাপড়। দু'টি শেষ না-হওয়া পেইন্টিং। রঙের টিউব, ব্রাশ। পিরিচে রঙ, চেয়ারে রঙ, মেঝেতে রঙ। জানালার পাশে আধা-খাওয়া চায়ের কাপের দিকে সারি বেঁধে লাল পিঁপড়ার দল যাচ্ছে। অপালা বলল, 'আপনি মনে হচ্ছে খুব গোছানো মানুষ।'

ফিরোজ জবাব দিল না।

'আপনি ড্রেস চেঞ্জ করুন, আমি বারান্দায় দাঁড়াচ্ছি।'

অপালা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সুখী-সুখী চোখে তাকিয়ে রইল রাস্তার মানুষজনদের দিকে। কত ব্যস্ত হয়েই-না এরা ছুটছে, দেখে মনে হয় এদের কারোর বিন্দুমাত্র অবসর নেই। সবার ভীষণ তাড়া।

ফিরোজ বেরিয়ে এসে বলল, 'আপনাকে এনে লজ্জাই লাগছে।'

অপালা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনার স্ত্রীকে এ-বাড়িতে দেখব। এখনো বিয়ে হয় নি?'

'না।'

'হবে তো শেষ পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, হবে।'

'আপনি বানিয়ে-বানিয়ে এ-সব বলছেন না তো?'

'বানিয়ে বলব কেন? আমার কী স্বার্থ?'

'তাও তো ঠিক। আচ্ছা শুনুন, একটা মজার জিনিস দেখলাম আপনার এখানে।

দুটো চড়ুই পাখি চা খাচ্ছে।'

'ওরা আমার পোষা চড়ুই। চা খাইয়ে-খাইয়ে পোষ মানিয়েছি।'

'আপনি কেন বানিয়ে-বানিয়ে এত মিথ্যা কথা বলেন?'

'চড়ুইগুলো যদি কথা বলতে পারত, তাহলে এরা বলত যে এটা সত্যি। দুর্ভাগ্যক্রমে এদের কথা আমরা বুঝি না।'

বাসা খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগল। গলির পর গলি, তস্য গলি। টিনের একটা ঘর। এর আবার নামও আছে-আনন্দকুটির।

ফিরোজ বলল, 'আমিও কি আসব আপনার সঙ্গে?'

'না, আপনি কেন আসবেন?'

'অপেক্ষা করব এখানে?'

'না, আমি নিজেই চলে যাব।'

'আমি না-হয় থাকি, আপনাকে রিকশায় তুলে তারপর যাব।'

'না। কেউ অপেক্ষা করে থাকলে আমার অস্বস্তি লাগে।'

ফিরোজ নিজেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। প্রচণ্ড জ্বরের আগমন সে টের পাচ্ছে। চোখ মেলে রাখতে পারছে না, বমি-বমি ভাব হচ্ছে। ফিরোজের ধারণা, অপালা এটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সে একটি কথাও বলছে না। সহজ ভদ্রতার দু'টি কথা কি বলা যায় না? সে যদি জিজ্ঞেস করে-আপনার কি খুব খারাপ লাগছে নাকি? তাতে তো জগৎ-সংসারের কোনো ক্ষতি হবে না। ফিরোজ বলল, 'হয়তো ওরা বাসায় নেই, কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গিয়েছে। আমি দাঁড়াচ্ছি, আপনি খোঁজ নিয়ে আসুন।'

অপালা হেসে ফেলল। ফিরোজ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'আপনি হাসছেন? এখন বাচ্চাদের পরীক্ষা-টরীক্ষা হয়ে গেছে, এই সময়ই সবাই নানার বাড়িতে বেড়াতে যায়।'

'যে-বাড়িতে যাচ্ছি, তাদের বড় মেয়েটির বিয়ে, কাজেই ওরা কোথাও যাবে না।'

'হয়তো দল বেঁধে কেনাকাটা করতে গিয়েছে। বড় মেয়ের বিয়েতে দল বেঁধে কেনাকাটা হয়। আমার বড় বোনের বিয়ের সময় দেখেছি। কাজের মেয়েটিকে পর্যন্ত আমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি। ঘর তালাবন্ধ করে গেলাম, ফিরে এসে দেখি চোর সব সাফা করে দিয়েছে।'

'ফিরোজ সাহেব!'

'জ্বি।'

'এখন চলে যান। প্লীজ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে ভালো লাগছে না।'

ফিরোজ গেল না। একটু শুধু সরে গেল। তার কেন জানি মনে হচ্ছে অপালা এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে। তখন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ হাঁটা যাবে। পাশাপাশি সাত পা হাঁটলে সাত পাকে বাঁধা পড়ে। অনেক বেশি পা হাঁটা হয়েছে। আরো হোক। সে লক্ষ পা হাঁটবে।

আশেপাশে কোনো চায়ের দোকান নেই যে বসা যায়। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

সামান্য জ্বরে শরীর বড় বেশি কাবু হয়েছে। অসুখ-অসুখ একটা গন্ধ বেরুচ্ছে গা থেকে। পেটে আবার পাক খেতে শুরু করেছে। এবার নির্ঘাত বমি হবে। অপালা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখবে সে রাস্তায় উবু হয়ে বসে বমি করছে। সে বড় কুৎসিত দৃশ্য। এই দৃশ্য অপালাকে কিছুতেই দেখানো যায় না। ফিরোজ একটা রিকশায় উঠে পড়ল।

অপালা অনেকক্ষণ হল কড়া নেড়েছে। ভেতর থেকে মিষ্টি গলায় একটি মেয়ে বলল, 'কে?'

অপালা কী বলবে ভেবে পেল না। সে যদি বলে—'আমি অপালা'। তাহলে কেউ কিছু বুঝবে না। শুধু 'আমি' বলারও কোনো মানে নেই। সে আবার কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে সেই মেয়েটি আবার বলল, 'কে?' যেন জবাব না-পেলে দরজা খুলবে না।

অপালা বলল, 'দরজাটা কি খোলা যাবে?'

খুট করে দরজা খুলল, তাও পুরোপুরি নয়। অল্প একটু ফাঁক করে বার-তের বছরের মেয়েটি মুখ বের করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটিকেই অপালা তাদের গেটের বাইরে দেখেছে। মেয়েটি কী-যে অবাক হয়েছে! চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে আছে। নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না। অপালাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে ছুটে ভেতরে চলে গেল। তার পরপরই অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বাড়ির সবাই যেন একসঙ্গে ছুটে আসছে। অপালার লজ্জা করতে লাগল।

এ-বাড়িতে বোধহয় কোনো ছেলে নেই। পাঁচটি বিভিন্ন বয়সের মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। এদের সবার মুখের দিকে খানিকক্ষণ করে তাকাল। একটি শীতল স্রোত বয়ে গেল অপালার গা দিয়ে। এই মেয়েগুলো দেখতে তার মতো, বিশেষ করে বড় মেয়েটি। অপালা কাঁপা গলায় বলল, 'তোমরা কেমন আছ?' কেউ কোনো জবাব দিল না। বাড়ির ভেতর থেকে এক জন মহিলা বললেন, 'ওকে ভেতরে নিয়ে আয়, ওকে ভেতরে নিয়ে আয়।' বড় মেয়েটি চাপা গলায় বলল, 'আস, ভেতরে আস।' বলেই সে অপালার হাত ধরল। যেন সে এদের অনেক দিনের পরিচিত কেউ। অপালা বলল, 'তোমরা কি আমাকে চেন?' তারা কেউ সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। ভেতর থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওকে নিয়ে আয়, ওকে ভেতরে নিয়ে আয়।'

চাদর গায়ে এক জন মহিলা বিছানায় শুয়ে আছেন। অপালা ঘরের ভেতর পা দেয়ামাত্র তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার দমকে তাঁর ছোট্ট শরীর থর-থর করে কাঁপছে। বড় মেয়েটি ছুটে গিয়ে তার মাকে ধরল। ফিস-ফিস করে বলল, 'কিছু হয় নাই মা, কিছু হয় নাই, তুমি চুপ কর।' ভদ্রমহিলা চুপ করতে পারছেন না।

অপালা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

ভদ্রমহিলা না-সূচক মাথা নাড়লেন।

'আপনি তাহলে এ-রকম করছেন কেন?'

বড় মেয়েটি একটি হাতপাখা নিয়ে তার মাকে দ্রুত হাওয়া করছে। মেজো মেয়েটি অপালার হাত ধরে বলল, 'তুমি বস। চেয়ারটায় বস।'

অপালা বসল। হাতের শাড়ির প্যাকেটটি নামিয়ে রেখে ক্লান্ত গলায় বলল, 'এ-বাড়ির যে মেয়েটির বিয়ে, তার জন্যে এই শাড়িটা এনেছি। বিয়ের দিন তো আসতে পারব না, তাই। বেশি লোকজন আমার ভালো লাগে না।'

অপালা কী বলছে নিজেও বুঝতে পারছে না। সে যেন ঘোরের মধ্যে কথা বলছে। পাঁচটি মেয়ের কেউই তার কথা শুনছে বলে মনে হল না। সবাই চোখ বড়-বড় করে অপালার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু বড় মেয়েটি তার মাকে নিয়ে ব্যস্ত। ভদ্রমহিলা এখন আর কোনো সাড়াশব্দ করছেন না। তাঁর চোখ বন্ধ। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। বড় মেয়েটি তার মা'র গলা পর্যন্ত চাদর টেনে মৃদু স্বরে বলল, 'এস, আমরা পাশের ঘরে যাই।'

'উনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। মা'র শরীর খুব খারাপ। মাঝে-মাঝে তাঁর এ-রকম হয়।'

'উনি আমাকে দেখে এ-রকম করলেন কেন?'

বড় মেয়েটি তার জবাব না-দিয়ে বলল, 'চল, পাশের ঘরে যাই।'

অপালা বলল, 'না, আমি পাশের ঘরে যাব না। আমি এখন চলে যাব। আমার ভালো লাগছে না। আমার একটুও ভালো লাগছে না।'

সে উঠে দাঁড়াল। আবার বলল, 'তোমরা কি আমাকে চেন?'

বড় মেয়েটি বলল, 'না, চিনি না।'

'সত্যি চেন না?'

'তোমার বাবা আমার বাবাকে অনেক সাহায্য করেছেন, সেইভাবে চিনি। আমার বাবার কোনো টাকাপয়সা ছিল না। প্রায় না-খেয়ে ছিলেন। বাবা-মা আর তাদের তিন মেয়ে। তখন তোমার বাবা আমাদের সাহায্য করেন। টাকাপয়সা দেন। বাবাকে একটা দোকান দিয়ে দেন। সেইভাবে তোমাকে চিনি।'

'সেই রকম চেনায় কেউ কি আমাকে তুমি বলবে?'

'তুমি বলায় কি রাগ করেছ?'

অপালা জবাব না-দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সে ঠিকভাবে পা ফেলতে পারছে না। তার যেন প্রচণ্ড জ্বর আসছে। নিঃশ্বাসও ঠিকমতো ফেলতে পারছে না। অপালার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা পাঁচ জনও বেরিয়ে এসেছে। মেজো মেয়েটি অপালার হাত ধরে কী বলতে চাইল। অপালা সেই হাত কাঁপা ভঙ্গিতে সরিয়ে প্রায় ছুটে গেল রাস্তার দিকে। তার মনে হচ্ছে, সে রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারবে না, তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে। তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

পাঁচ বোন দরজা ধরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, যেন তারা কোনো কারণে খুব ভয় পেয়েছে।

রাত দশটা।

নিশানাথবাবু দোতলায় উঠে এসে অপালার দরজায় ধাক্কা দিলেন।

'মা, একটু দরজা খুলবে?'

অপালা দরজা খুলল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি এলোমেলো। নিশানাথবাবু মৃদু স্বরে বললেন, 'কি হয়েছে?'

'কই, কিছু হয় নি তো। কী হবে?'

'আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'ম্যানেজারকাকু, আজ আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না। আপনি এখন যান। আপনার পায়ে পড়ি।'

নিশানাথবাবু আবার নিচে নেমে গেলেন। সেই রাতে তিনি আর বাড়ি ফিরলেন না। একতলার গেস্টরুমে রাত কাটালেন।

ফখরুদ্দিন সাহেব গভীর রাতে টেলিফোন করলেন। গভীর রাতের টেলিফোনে গলা অন্যরকম শোনা যায়। চেনা মানুষকেও অচেনা মনে হয়। অপালা বলল, 'আপনি কে?'

ফখরুদ্দিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না, মা?'

'ও, বাবা তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি। তোমার কী হয়েছে?'

'কই, কিছু হয় নি তো!'

'মা, সত্যি করে বল তো।'

'সত্যি বলছি, আমার কিছু হয় নি, শুধু.....'

'শুধু কি?'

'আমার খুব একা-একা লাগছে বাবা।'

ফখরুদ্দিন সাহেব টেলিফোনেই কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর অসম্ভব মন-খারাপ হয়ে গেল।

'মা, তুমি কি কাঁদছ?'

'হ্যাঁ, কাঁদছি। আর কাঁদব না।'

'কিছু-একটা তোমার হয়েছে। সেটা কী?'

অপালা চুপ করে রইল। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'আমাকে বলতে কি তোমার কোনো বাধা আছে?'

'বলার মতো কিছু হয় নি বাবা।'

'কোনো ছেলের সঙ্গে কি তোমার ভাব হয়েছে? নিশানাথ বলছিল আর্টিস্ট একটা ছেলে নাকি আসে প্রায়ই। তুমি কি আজ তার কাছে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'সে কি এমন কিছু বলেছে, যাতে তোমার মন-খারাপ হয়েছে?'

'না।'

'এই ছেলেটিকে তোমার কি পছন্দ হয়? যদি হয় আমাকে বল। তুমি যা চাইবে তাই হবে। যা হওয়ার নয়, তাও আমি হওয়াব। আমার প্রচুর ক্ষমতা।'

ফখরুদ্দিন সাহেবের মনে হল, অপালা আবার কাঁদতে শুরু করেছে। তিনি বললেন, 'ঐ ছেলে যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, আমি টেনে তার জিভ ছিঁড়ে

ফেলব।'

'ঐ–সব কিছু না বাবা, এমনিতেই আমার মন–খারাপ। তুমি তো জান, মাঝে–মাঝে আমার মন–খারাপ হয়।

'এটা তো ভালো কথা না। এটা একটা অসুখ, এর নাম মেলাংকলি। আমি ঢাকায় এসেই বড়–বড় ডাক্তার দেখাব।'

'কবে আসবে ঢাকায়?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলা শেষ হলেই আমি ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করব। এখানে আমার অনেক ঝামেলা, তবুও আমি ফার্স্ট এ্যাভেইলেবল ফ্লাইটে চলে আসব। তোমার মা'কেও নিয়ে আসব।'

'আচ্ছা।'

'তুমি কি আর কিছু বলবে?'

'না।'

'তুমি কি জেগে ছিলে নাকি মা?'

'হ্যাঁ।'

'এত রাত পর্যন্ত জেগে–জেগে কী করছিলে?'

'ছবি দেখছিলাম।'

'কী ছবি দেখছিলে?'

'আমার ছবি। কত ছবি যে তোমরা আমার তুলেছ!'

'দ্যাটস রাইট। ফটোগ্রাফির হবিটা একসময় বেশ জোরালই ছিল। এখন নেই। ভাবছি, আবার শুরু করব। একটা ডার্ক রুম বানিয়ে নিজেই ছবি ডেভেলপ করব। কেমন হবে?'

'ভালোই হবে। বাবা।'

'বল মা।'

'আমার এত ছবি, কিন্তু খুব ছোটবেলার ছবি নেই কেন?'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'জন্মের পর–পর তোলা ছবি। এক বছর–দু' বছর বয়সের ছবি।'

ফখরুদ্দিন সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। অপালা যখন দ্বিতীয় বার প্রশ্নটি করতে যাবে তখন তিনি বললেন, 'তোমার ছোটবেলার ছবিও আছে। না–থাকার তো কোনো কারণ নেই। আমি এসে তোমাকে খুঁজে দেব।'

'আচ্ছা।'

'তোমার ছোটবেলায় আমি একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম। ব্যবসা–সংক্রান্ত ঝামেলা। মন–মেজাজ ভালো ছিল না। প্রচুর ছোটাছুটি করতে হত, ছবি তোলার তেমন মুড ছিল না। ছবি তোলা, কবিতা এবং গল্প লেখার মতোই একটা মুডের ব্যাপার।'

'তা ঠিক।'

'একেবারেই যে তুলি নি তা নয়। কিছু–কিছু নিশ্চয়ই তোলা হয়েছে। তবে আরো বেশি তোলার প্রয়োজন ছিল। আমি ফিরে আসি, তারপর দেখবে প্রতিদিন এক রোল করে স্ন্যাপ নেব।'

'বাবা।'

'বল মা।'

'আগামী কাল আমার একটা পরীক্ষা আছে।'

'ও, আই অ্যাম সরি। এতক্ষণ তোমাকে ডিস্টার্ব করা খুবই অনুচিত হয়েছে।'

অপালা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'কাল যদি পরীক্ষাটা না দিই, তাহলে কি তুমি রাগ করবে?'

'মা, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'কাল আমার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করছে না। যদি পরীক্ষার হলে যাই, তাতেও লাভ হবে না। একটা লাইনও লিখতে পারব না।'

'কেন?'

'আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।'

'শরীর খারাপ লাগলে তো পরীক্ষা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মা, তুমি শুয়ে থাক। আমি আসছি, এসেই সব ঠিক করে দেব।'

অপালা টেলিফোন রেখে খাবার ঘরে গেল। এত রাত হয়েছে, তবু কেউ ঘুমায় নি। সবাই জেগে আছে। সে আজ সারা দিন কিছু খায় নি, রাতেও খায় নি—এই জন্যেই জেগে আছে হয়তো।'

'রমিলা।'

'জ্বি আফা।'

'আমি এক কাপ কফি খাব। খুব কড়া করে এক কাপ কফি দাও।'

'সাথে আর কিছু দিব আফা?'

'এক টুকরো পনির কেটে দিও। আমার ঘরে নিয়ে এসো। আর শোন, তোমরা সবাই জেগে আছ কেন? শুয়ে পড়।'

অনেক দিন পর অপালা তার খাতা নিয়ে বসেছে। ঘুম-ঘুম একটা ভাব ছিল, কফি খাওয়ায় সেই ভাব কেটে গেছে। খুব ক্লান্তি লাগছে, আবার ইচ্ছেও করছে কিছু-একটা লিখতে। অপালা লিখতে শুরু করল।

## আমার বাবা

যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন বাংলার স্যার একটা রচনা লিখতে দিলেন—তোমার প্রিয় মানুষ। কেউ লিখল রবীন্দ্রনাথ, কেউ শরৎচন্দ্র। কিছু-কিছু স্মার্ট মেয়েরা বিদেশের নামকরা লোকদের প্রিয় মানুষ বানিয়ে রচনা লিখল, লেনিন, আইনস্টাইন, মাদার তেরেসা। আমি লিখলাম, আমার প্রিয় মানুষ আমার বাবা। কেন তিনি আমার প্রিয় মানুষ তাও লিখলাম। ছোট-ছোট কিছু ঘটনার কথা লিখলাম—যেমন, আমার এক বার টনসিল অপারেশন হল। সলিড কিছু খেতে পারি না। বাবার তা দেখে খুব কষ্ট হল। তিনি বললেন, আমার মা যত দিন সুস্থ না হয়েছে, তত দিন আমিও সলিড কিছু খাব না। সত্যি-সত্যি তিন দিন তাই করলেন। দুধ, মুরগির সুপ এইসব খেয়ে কাটালেন। আরেক বার আমার প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা। মাঢ়ীর হাড়ে কী যেন হয়েছে। কত ওষুধ কত ডাক্তার, ব্যথা কমে না। আমার কষ্ট দেখে বাবা যেন কী-রকম হয়ে গেলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট বাচ্চাদের মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার! বাবার কান্না শুনে আমার ব্যথা কমে গেল। আমি বললাম, বাবা তুমি কাঁদবে না, আমার ব্যথা কমে গেছে। বাবা মনে করলেন আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলছি। তিনি আরো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। এই

মানুষটি যদি আমার প্রিয় না-হয়, তাহলে কে হবে? রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, মাদার তেরেসা—এঁরা মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ, পৃথিবীর সবার প্রিয়। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ, আমার প্রিয় মানুষটিও সামান্য।

এই রচনা নিয়ে কত কাণ্ড! আমাদের বাংলার স্যার কবিরউদ্দিন খুব খুশি। ক্লাসে সবাইকে পড়ে শোনালেন। শুধু তাই না, লেখাটা কপি করে তিনি দৈনিক বাংলার শিশুদের পাতায় ছাপতে দিলেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, লেখাটা সেখানে ছাপাও হল। এটাই আমার প্রথম ছাপা লেখা এবং এটাই শেষ।

বাবা এই লেখা পড়লেন না। কারণ তিনি জানেনই না যে তাঁর মেয়ের একটা লেখা ছাপা হয়েছে। আমার খুব ইচ্ছা করছিল বাবাকে লেখাটা পড়াই, আবার লজ্জাও লাগছিল। নিজের গোপন ভালবাসার কথা জানাতে লজ্জা করে.....।

আমার মনে হয় লজ্জা একটু বেশি। মা এত অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, আমার এত খারাপ লাগে, কিন্তু নিজের খারাপ লাগার কথা মা'কে কখনো জানাই না। জানাতে ইচ্ছা করে না। সবসময় মনে হয় নিজের মনের কথা থাকুক না মনে! কী হবে সবাইকে জানিয়ে?

ভোরবেলা খুব সহজভাবে অপালা নিচে নেমে এল। নাশতার টেবিলে বসল। নিশানাথবাবুর স্ত্রী প্রায় ছুটে এলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে অপালা বলল, 'একটা হাসির গল্প বলুন তো কাকিমা।'

তিনি খুবই অবাক হলেন। এত অবাক হলেন যে হাসির গল্প মনে এল না। তিনি হাসির গল্পের জন্যে আকাশপাতাল হাতড়াতে লাগলেন। অপালা নাশতা শেষ করে অরুণা-বরুণার খোঁজে গেল। অরুণা তাকে বিশেষ পছন্দ করে না, তবে বরুণা তার জন্যে পাগল। আজ দু' জনই ছুটে এল। লাফালাফি করতে লাগল। বরুণার স্বভাব হচ্ছে আদর দেখানোর জন্যে পা কামড়ে ধরার ভঙ্গি করা। অপালা যখন বলে—এই, এ-সব কী! তখন তার ফুর্তির সীমা থাকে না। অনেকটা দূরে ছুটে যায়, আবার দৌড়ে এসে কামড়ের ভঙ্গি করে। আজ দু' জনই এক খেলা খেলছে। দু'জনের মনেই আনন্দ।

গোমেজ এসে বলল, 'আপা, আপনার টেলিফোন।'

গোমেজের হাতে এক কাপ কফি।

'আপা, কফিটা নিন। অন্য রকম করে বানিয়েছি।'

'অন্য রকম মানে? লবণ দিয়েছ নাকি গোমেজ ভাই?'

'খেয়ে দেখেন আপা।'

অপালা কফির কাপ হাতে টেলিফোন ধরতে গেল। টেলিফোন করেছেন মা। তাঁর গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। যেন খুব সূক্ষ্মভাবে কাঁপছে।

'মা, তুই কেমন আছিস?'

'আমি ভালো আছি। আমি খারাপ থাকব কেন? আমার তো আর হার্টের অসুখ হয় নি।'

'আজ তোর পরীক্ষা না?'

'হ্যাঁ, বিকেলে।'

'তোর বাবা বলছিল, তুই নাকি পরীক্ষা দিবি না?'

'পরীক্ষা দেব না কেন? এত পড়াশোনা শুধু-শুধু করলাম? তবে পরীক্ষাটা খুব খারাপ হবে।

'তুই কাল তোর বাবাকে কী বলেছিলি? সে সারা রাত ঘুমুতে পারে নি।'

'ও–মা, সে কী কথা। আমি তো কিছু বলি নি। কই, বাবাকে দাও তো, তোমার কাছে আছেন না?'

'না। টিকিটের জন্যে ছোটাছুটি করছে। টিকিট পাচ্ছে না। এখন গেছে অ্যারোফ্লটের অফিসে—মস্কো হয়ে ঢাকায় যাবে।'

'তোমাদের এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমার কিছু হয় নি। আমি খুব ভালো আছি।'

'সত্যি ভালো আছিস?''

'হ্যাঁ, সত্যি ভালো। মিথ্যা ভালো আবার কেউ থাকে নাকি?'

অপালা হেসে ফেলল।

প্রশ্ন হাতে নিয়ে অপালার জ্বর এসে গেল। সব অচেনা। মনে হচ্ছে অন্য কোনো সাবজেক্টের প্রশ্ন ভুল করে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, লিখতে গিয়ে দেখল সে লিখতে পারছে। উত্তরগুলো বেশ ভালোই হল। রিগ্রেশন মডেলের একটা জটিল অঙ্কও শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে ফেলল। কে জানে, হয়তো এই শেষ পরীক্ষাটাই তার সবচেয়ে ভালো হয়েছে।

অনার্সের কঠিন কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। বেশ লাগছে তার। ইচ্ছে করছে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে। গাড়িতে করে নয়, হেঁটে–হেঁটে। ফিরোজ নামের ঐ ছেলেটিকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়? তাকে গিয়ে সে যদি বলে, আপনি আপনার বান্ধবীর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন, ঐ মেয়েটিকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

হাজি সহেব অবাক হয়ে একটি দৃশ্য দেখলেন। বিশাল একটা নীল রঙের গাড়ি তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। লম্বা, ফর্সা একটা মেয়ে নামছে গাড়ি থেকে। বেশ সহজ–স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দোতলায় উঠে যাচ্ছে। যেন অনেক বার সে এসেছে। সবকিছু তার খুব ভালো চেনা। দোতলায় এই মেয়েটি কার কাছে যাচ্ছে? মেয়েটির বয়স এমন যে চট করে তুমি বলা যায় না। আবার তাঁর মতো একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে আপনি করে বলাও মুশকিল। তাঁর বড় মেয়ের বয়স নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি। হাজি সাহেব ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

অপালা সিঁড়ির মাঝামাঝি থেমে গেল। দু' পা নেমে এসে বলল, 'ফিরোজ বলে এক জন ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর কাছে।'

'উনি তো হাসপাতালে।'

'সে কী, কেন?

'আকাশপাতাল জ্বর। আমিই হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি।'

'কোন হাসপাতাল, কত নম্বর বেড, এইসব বলতে পারবেন?'

'মুখস্থ বলতে পারব না। আমার কিচ্ছু মনে থাকে না। তবে লেখা আছে। আমার সঙ্গে এস, দিচ্ছি।'

অপালা নেমে এল। হাজি সাহেব বললেন, 'ফিরোজ তোমার কে হয়?'

'কিছু হয় না। আমার খুব পরিচিত।'

হাজি সাহেবের ভুরু কুঞ্চিত হল। বেফাঁস কিছু বলে ফেলছিলেন, বহু কষ্টে নিজেকে সামলালেন। মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে হাসপাতালের নাম-ঠিকানা দেবার কোনো আগ্রহ এখন আর অনুভব করছেন না। তবু মুখের ওপর বলা যায় না।—তুমি চলে যাও, তোমাকে কিচ্ছু দেব না।

অপালা হাজি সাহেবের পিছনে-পিছনে বসার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে তার জন্যে বড় রকমের একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। হাজি সাহেবের ছোট মেয়ে বিছানার ওপর বসে আছে। তার ছবিই সে ফিরোজের কাছে দেখেছে। মেয়েটি ছবির চেয়েও অনেক সুন্দর। তবে সে বোধহয় নিজের পরিবারের বাইরে কারো সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত নয়। খুব হকচকিয়ে গেছে। একটি কথাও না-বলে চলে যাচ্ছে ভেতরের দিকে। কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে। এমনভাবে হাঁটছে কেন?

অপালা বলল, 'এই মেয়েটির সঙ্গেই কি ফিরোজ সাহেবের বিয়ের কথা হচ্ছে?'

হাজি সাহেব এবং তাঁর মেয়ে দু' জনই চমকে উঠল। মেয়েটি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাজি সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর হাতে একটা নোটবই। নোটবইটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'বিয়ের কথা তুমি কী বললে?'

'আমি বোধহয় কোনো ভুল করেছি। কিছু মনে করবেন না।'

'ভুল না, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি গোড়া থেকে সে-রকমই সন্দেহ করছিলাম। ওর মা'কে বলেছিও কয়েক বার।'

দরজা ধরে দাঁড়ানো মেয়েটি চট করে সরে গেল। হাজি সাহেব বললেন, 'মুখ ফুটে নিজের কথা বললেই হয়, কিংবা আত্মীয়স্বজনদের দিয়ে বলাতে পারে, তা না।'

বিস্মিত অপালা বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে তাহলে উনি আপনাদের কিছু বলেন নি?'

'আরে না! একেক সময় একেক কথা বলে। এক বার বলল—বিয়ের সব দায়িত্ব আমার। তখনই সন্দেহ হল। চালাক ছেলে। তুমি বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন? দাঁড়াও, চায়ের কথা বলে আসি। আর এই হল ঠিকানা, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ওয়ার্ড নাম্বার পাঁচ। বেড নাম্বার তেতাল্লিশ। ওয়ার্ডে ঢুকেই প্রথম বিছানাটা।'

অপালাকে ঘন্টাখানেক বসতে হল। হাজি সাহেবের স্ত্রী এই এক ঘন্টা ক্রমাগত কথা বললেন। মোটাসোটা ধরনের মহিলা, কথা বলার সময় খুব হাত নাড়ান। শুরুই করলেন 'মা' ডাক দিয়ে।

'মা, তোমার নাম কি?'

'অপালা।'

'ও-মা, কী অদ্ভুত নাম। তুমি আমার কথায় কিছু মনে করলে না তো?'

'জ্বি-না।'

'তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি। একটা ঝামেলা মিটে গেল। ছেলের মনে কী ছিল তা তো আর আমরা জানি না। জানলে এত দিনে শুভ কাজ সমাধা হয়ে যেত ইন্‌শাআল্লাহ্‌।'

হাজি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এসেই কী বকবক শুরু করলে? চুপ কর

তো।'

'চুপ করব কেন? আমরা মেয়েতে-মেয়েতে কথা বলছি, তুমি এর মধ্যে থাকবে না। বারান্দায় গিয়ে বস।'

মেয়েটি চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকেছে। একটা প্লেটে পাঁপর ভাজা, অন্য একটা প্লেটে সুজির হালুয়া। সে খুব সাবধানে ট্রে নামিয়ে রাখল। এক বারও চোখ তুলে তাকাল না। ভয়ে-সঙ্কোচে সে এতটুকু হয়ে গেছে। এখন ভালো লাগছে মেয়েটিকে দেখতে।

হাজি সাহেবের বাড়ি থেকে বেরুতে-বেরুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা কারো বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে না। সন্ধ্যাবেলা শুধু পশু এবং পাখিরাই ঘরে ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়। মানুষ হয় না। উষা এবং গোধূলি হচ্ছে গৃহত্যাগের লগ্ন।

ড্রাইভার বলল, 'বাসায় যাব আপা?'

'না, এমনি একটু রাস্তায় চালান।'

'মীরপুর রোড ধরে যাব?'

'যান।'

শ্যামলীতে বড় খালার বাড়ি। তাঁর সঙ্গে এক বার দেখা করে এলে কেমন হয়? কত দিন ও-বাড়িতে যাওয়া হয় না। খালাও আসেন না। মা মাঝে-মাঝে এ-বাড়িতে আসেন, কিন্তু অপালাকে সঙ্গে আনেন না। কেন আনেন না এ নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায় নি। আজ তার মাথায় ঝম-ঝম করে বাজতে লাগল—মা আমাকে এ-বাড়িতে আনেন না, মা আমাকে এ-বাড়িতে আনেন না। যেন রেকর্ডে পিন আটকে গেছে, তুলে না-দেয়া পর্যন্ত বাজতেই থাকবে।

'ড্রাইভার সাহেব।'

'জ্বি আপা।'

'শ্যামলী চলুন। বড় খালার বাসায়। বড় খালার বাসা চেনেন না?'

'জ্বি, চিনি। চিনব না কেন?'

বড় খালা অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'তারপর রাজকন্যা, কেমন আছ?'

অপালা হেসে ফেলল।

'আমি ভালো আছি বড় খালা।'

'সন্ধ্যাবেলা কী মনে করে? আমাদের বাড়িঘর তো তোমার জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা। ফরবিডেন জোন।'

'ফরবিডেন জোন হবে কেন?'

'আমি তো জানি না, আছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ। রাজকন্যারা কি সব জায়গায় যেতে পারে, না যেতে পারা উচিত? বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'বসব না খালা। আমি এখন যাব।'

'এখন যাবে মানে! তাহলে এসেছ কেন?'

অপালা বসল। বড় খালা গম্ভীর মুখে বললেন, 'এমনিতে তো তোমাদের খবর পাওয়ার উপায় নেই। পত্রিকায় অবশ্যি ইদানীং পাচ্ছি।'

অপালা বিস্মিত হয়ে বলল, 'পত্রিকায় খবর মানে! পত্রিকায় আবার কী খবর?'

'সে কী! তুমি পত্রিকা পড় না?'

'জ্বি–না।'

'দেশি পত্রিকা তোমার বাবা পড়তে দেন না বোধহয়।'

'তা নয় খালা, ইচ্ছা করে না। কী খবর বেরিয়েছে?'

'দু'টা খুন হয়েছে তোমাদের টঙ্গির কারখানায়। খুনী ধরা পড়েছে। তার ছবিটবি দিয়ে নিউজ হয়েছে। সে বলছে, তোমার বাবার নির্দেশেই এই কাণ্ড সে করেছে। সব পত্রিকাতেই তো আছে, তুমি কিছুই জান না?'

'জ্বি–না।'

'না– জানাই ভালো।'

'খুব চিন্তা লাগছে খালা।'

'চিন্তা লাগার কী আছে? টাকাওয়ালা মানুষদের এইসব সামান্য জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। তোমার বাবা আসুক। দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে। ঐ খুনীই তখন উল্টো কথা বলবে। বস তুমি, আমি দেখি, চা–টার ব্যবস্থা করি। তোমার ঠিকমতো যত্ন হয় নি—এই খবর তোমার বাবার কানে উঠলে উনি রেগে যাবেন। জগৎ শেঠদের রাগাতে নেই।'

অপালা একা–একা বসে রইল। এক বার বড় খালার মেয়ে বিনু এসে বলল, 'ছবি দেখবে আপা? "বালিকা বধূ" আছে। খুব ভালো প্রিন্ট।'

'তুমি দেখ। আমার ইচ্ছা করছে না।'

'আমি চার বার দেখেছি আপা। তুমি দেখলে তোমার সঙ্গে আবার দেখব।'

'আমার আজ একটুও ইচ্ছা করছে না। ভীষণ মাথা ধরেছে।'

মাথা ধরার ব্যাপারটা মিথ্যা নয়। আসলেই প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। ইচ্ছে করছে ছুটে বেরিয়ে যেতে। তা সম্ভব নয়। বড় খালা তার সামনে প্রচুর খাবারদাবার সাজিয়ে রাখছেন। তাঁর মুখে কী অদ্ভুত এক ধরনের কাঠিন্য!

'বড় খালা।'

'বল।'

'আমার জন্ম কি হাসপাতালে হয়েছিল?'

'তা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, জানেন না?'

'জানব না কেন? নাও, চা খাও। তুমি কি এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে এসেছিলে?'

'জ্বি–না। হঠাৎ মনে হল।'

'তোমার বাবা–মা ফিরবেন কবে?'

'টিকিট নিয়ে কী–সব ঝামেলা হচ্ছে, ঝামেলা মিটলেই ফিরবেন।'

'একা–একা থাক—আমাদের খোঁজখবর নেয়া উচিত, কিন্তু নিতে পারি না। কেন জান?'

'জ্বি–না।'

'তোমাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা মানেই আগ বাড়িয়ে গালে চড় খাওয়া। পত্রিকায় খবর দেখার পর তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম। কী বলল, জান?'

'কী বলল?'

'বলল, তুমি পড়াশোনা করছ, তোমাকে ডাকা যাবে না।'

'ওদের দোষ নেই খালা আমিই বলে দিয়েছিলাম।'

'ভালো, খুব ভালো।'

প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে অপালা বাসায় ফিরল। বাসায় অনেক মানুষ। ড্রয়িং রুমে আলো জ্বলছে। কিছু লোকজন বসে আছে সেখানে। বারান্দায় চিন্তিত মুখে ম্যানেজারবাবু এবং চিটাগাং ব্রাঞ্চের জি এম হাঁটাহাঁটি করছেন। নিশানাথবাবু ছুটে এলেন, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

অপালা তার জবাব দিল না। নিশানাথবাবু বললেন, 'তুমি একটু বসার ঘরে এস। পুলিশের কয়েকজন অফিসার এসেছেন।'

'আমার সঙ্গে তো তাঁদের কোনো দরকার নেই।'

'আমরা বলেছি। তবু তাঁরা কথা বলতে চান। অনেকক্ষণ বসে আছেন।'

'আমি তাঁদের সঙ্গে কোনো কথা বলব না।'

'মা, তুমি বুঝতে পারছ না।'

'আমার কিছু বোঝার দরকার নেই। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি এখন ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকব।'

'দু'-এক মিনিটের ব্যাপার।'

'ম্যানেজারকাকু, আপনি আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

অপালা দোতলায় উঠে গেল। এক বারও ফিরে তাকাল না। নিশানাথবাবুর চিন্তিত মুখ আরো ঝুলে পড়ল।

নার্সদের মুখশ্রী ভালো থাকা উচিত।

ফিরোজের তাই ধারণা। যেন মুখের দিকে তাকিয়েই মন প্রফুল্ল হয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মোমবাতি হাতে হেঁটে যাচ্ছেন—এই দৃশ্য দেখে রুগীরা নতুন আশায় বুক বেঁধেছে। কারণ ঐ মহিলা ছিলেন অসম্ভব রূপবতী। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যদি তাড়কা রাক্ষসীর মতো হতেন, তাহলে রুগীরা নিশ্চয়ই রাতের বেলা এই দৃশ্য দেখ ভিরমি খেত।

এই হাসপাতালে যে-ক'টি নার্স ফিরোজ দেখেছে সবাই হয় তাড়কা রাক্ষসী, নয়তো তাড়কা রাক্ষসী হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ডাক্তার এবং নার্সদের প্রেম নিয়ে অনেক সুন্দর-সুন্দর গল্প-উপন্যাস আছে। সে-সব নিশ্চয়ই বানানো। এই ওয়ার্ডে যে গত দু'দিন ধরে আসছে তার চেহারা মন্দ নয়, তবে কথাবার্তা অসহ্য।

ধমক না-দিয়ে কোনো কথা বলে না। আজ সকালেই ফিরোজের সঙ্গে বড় রকমের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। মেয়েটি ওয়ার্ডে ঢুকেই কড়া গলায় বলল, 'এই যে লোক, বসে আছেন কেন?'

'এই যে লোক' বলে কেউ সম্বোধন করতে পারে, এটাই ফিরোজের ধারণা ছিল না। সে বহু কষ্টে রাগ সামলে বলল, 'বসে থাকা নিষেধ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আছে। শুয়ে-শুয়ে রেস্ট নিন। ডন-বৈঠকের জন্যে হাসপাতাল না।'

ফিরোজ শুয়ে পড়ল। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাত-দুপুরে আজেবাজে কোনো ওষুধ খাইয়ে দিতে পারে। একটা থ্রিলারে এ-রকম একটা ঘটনা ছিল। নার্স রাত-দুপুরে ঘুমের ওষুধ বলে আফিমের ঢেলা গিলিয়ে দিত। অবশ্যি সেই নার্স ছিল রূপবতী এবং সে বেছে-বেছে এই কাণ্ডগুলো করত রূপবান তরুণ রুগীদের সঙ্গে।

ফিরোজ গলা পর্যন্ত চাদর টেনে কৌতূহলী চোখে নার্সটাকে দেখছে। এই মহিলা এক-একটা বেডের কাছে যাচ্ছে এবং বিনা কারণে রুগীদের ধমকাচ্ছে। গরিব রুগীদের তুমি-তুমি করে বলছে। সে ঘুরে-ঘুরে আবার ফিরোজের কাছে ফিরে এল।

'আপনার জ্বর রেমিশন হয়েছে।'

ফিরোজ জবাব দিল না। নার্স তার এ্যাপ্রনের পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'আপনার একটা চিঠি এসেছে। গত কাল দিতে ভুলে গেছি। এই নিন।'

'ফিরোজ থমথমে গলায় বলল, 'আপনি চিঠি পড়েছেন কেন? খামের মুখ খোলা।

'আপনার চিঠি পড়ার আমার দরকারটা কী? মুখখোলা অবস্থাতেই এসেছে। চিঠি পড়ুন, বালিশের নিচে রেখে দিচ্ছেন কেন?'

'আপনি এখান থেকে যান, তারপর পড়ব।'

নার্স চলে যাবার পরও সে চিঠি পড়ল না। হাসপাতালে বসে চিঠি পাওয়ার বিস্ময়টা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যাক। নার্স যে চিঠিটা পড়েছে, তাতে তাকে ঠিক দোষ দেয়া যায় না। হাসপাতালের রুগীদের কেউ চিঠি লেখে না, দেখতে আসে। গত দশ বছরে এটাই হয়তো প্রথম চিঠি এবং ফিরোজের ধারণা, হাসপাতালের জমাদারনী, মালী, ওয়ার্ডবয়—সবাই এই চিঠি পড়েছে।

কে লিখতে পারে এই চিঠি? তাজিন? হতে পারে। পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র সে-ই তাকে দেখতে আসে নি। দুলাভাই বলেছেন—রাগ করে আসে নি। ফিরোজ অবাক হয়ে বলেছে, 'রাগ কী জন্যে?'

'নিজের দিকে তুমি তাকাবে না। অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে খবর পাঠাবে, সে রাগ করবে না? শোন ফিরোজ, তুমি কথা দাও, রিলিজ হলে আমার বাসায় গিয়ে উঠবে।'

'কথা দিলাম।'

'আমরা যে-মেয়ে ঠিক করব, চোখ বন্ধ করে তাকে বিয়ে করবে।'

'কথা দিলাম।'

'তোমাকে কেবিনে ট্র্যান্সফারের ব্যবস্থা করছি। সব ধরাধরির ব্যাপার। এক জন মেজর জেনারেলকে আজ ধরব। আমার ভাবির ফুপাত ভাই।'

'কাউকে ধরতে হবে না দুলাভাই। ওয়ার্ডে আমি ভালোই আছি। আশেপাশের রুগীদের সঙ্গে খাতির হয়েছে। গল্পগুজব করে সময় কেটে যাচ্ছে।'

'কার সঙ্গে খাতির হল?'

'বাঁ পাশের বেডের রুগীর সঙ্গে। খাতিরটা আরো জমত, বেচারা হঠাৎ মরে যাওয়ায় খাতিরটা জমতে পারল না।'

'সবসময় এমন ঠাট্টা-তামাশা করো না। মৃত্যু নিয়ে রসিকতা করবে না।'

'আর করব না। আপনি দুলাভাই, বড় আপাকে পাঠিয়ে দেবেন। আপাকে দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'বাজে কথা বলবে না। তোমার কাউকেই দেখতে ইচ্ছা করে না।'

তাজিনই নিশ্চয় এই পত্রলেখক। চিঠিপত্র লেখার অভ্যেস তার আছে। জন্মদিন, নববর্ষ—এইসব বিশেষ দিনগুলোতে তার একটা সুন্দর কার্ড আসবেই।

এটাও বোধহয় একটা কার্ড। 'গেট ওয়েল' কার্ড। বড় আপার কাছে নানান ধরনের কার্ডের বিরাট সংগ্রহ।

ফিরোজ ভেবেছিল গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে চিঠি পড়বে। এতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, চিঠির রচয়িতা হয়তো–বা অপালা। এ–রকম মনে হবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে।

খাম খুলে ফিরোজের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। অপালাই লিখেছে। আহ্, এত গভীর আনন্দের ব্যাপারও ঘটতে পারে! চিঠিটি পড়তে ইচ্ছে করছে না। পড়া মানেই তো ফুরিয়ে যাওয়া। বরং গুটি–গুটি লেখার তিনটি পৃষ্ঠা নিয়ে সে সারা রাত জেগে বসে থাকবে। মাঝে–মাঝে ঘ্রাণ নেবে। এই কাগজ কোনো ফুলের গুচ্ছ নয়। তবু নেশা–ধরানো সৌরভ নিশ্চয়ই লুকানো আছে। সবাই সে সৌরভ পাবে না। যার পাবার শুধু সে–ই পাবে।

*ফিরোজ সাহেব।*

*আপনার হাসপাতালের ঠিকানা কোথায় পেয়েছি বলুন তো? না, এখন বলব না, আপনি ভাবতে থাকুন। এটা একটা ধাঁধা। দেখি আপনি কেমন বুদ্ধিমান। ধাঁধার জবাব দিতে পারেন কি না।*

*আমি হাসপাতালে আপনাকে দেখতে আসি নি, যদিও খুব আসার ইচ্ছা ছিল। কেন আসি নি জানেন? ছোটবেলায় আমাদের এক জন কাজের মেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসে। তাকে দেখবার জন্যে এক দিন হাসপাতালে এসে কী দেখি, জানেন? দেখি দু'–তিন মাস বয়সী একটা বাচ্চাকে বড় একটা গামলায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। বাচ্চাটা মরা। বাচ্চার নাভি ও নাকে লাল–লাল পিঁপড়া। এই কুৎসিত দৃশ্যটি দুঃস্বপ্ন হয়ে বার–বার আমার কাছে ফিরে আসে। হাসপাতালে যেতে আমার এই কারণেই ইচ্ছা করে না।*

*এখন বলি আপনার ঠিকানা কোথায় পেলাম। আপনার বান্ধবীর বাবার কাছ থেকে। আপনার বান্ধবীর সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। খুব লাজুক মেয়ে, তবু কিছু কথা শেষ পর্যন্ত বলেছে। তবে আমার ধারণা, আপনার সঙ্গে সে খুব বক–বক করবে।*

*আচ্ছা, আপনি আমাকে কিন্তু একটা ভুল কথা বলেছেন। আপনাদের বিয়ের ব্যাপারে। ভুল আমি ভেঙে দিয়েছি। আপনার বান্ধবী, তার বাবা এবং মা সবাই খুব খুশি। তারা মনে–মনে সুপাত্র হিসেবে আপনাকে কামনা করছিলেন। মনের কথাটা পর্যন্ত বললেন না! আপনার সঙ্গে এই দিকে আমার কিছু মিল আছে। আমিও নিজের মনের কথাটা কিছুতেই বলতে পারি না। আমার একটা ডাইরি আছে, মাঝে–মাঝে তাতে লিখি। এই মুহূর্তে আপনাকে আমার একটা মনের কথা বলি। আমার মনে হচ্ছে, এখন বললে সেটা খুব দোষের হবে না। কথাটা হচ্ছে, আমি যখন জানলাম—আপনার এক জন ভালবাসার মানুষ আছে, তখন আমার কেন জানি মন–খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মন–খারাপ ভাবটা এখনো পুরোপুরি কাটে নি। কাটতেই যে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। না–কাটাই ভালো। কী বলেন আপনি? আমি ঠিক বলি নি? কিছু–কিছু কষ্ট আছে সুখের মতো। আবার কিছু–কিছু কষ্ট খুব কঠিন।*

*এখন আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। আপনি সুস্থ হয়ে উঠলেই আপনাকে নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যাব। যেখানে যাব, সেখানে চমৎকার একটা রহস্য আছে। দেখি, আপনি রহস্য ভেদ*

*করতে পারেন কি না। আমার মনে হয় আপনি পারবেন। কারণ, আপনার খুব বুদ্ধি—অন্তত আমার তাই ধারণা।*

*এই চিঠি আপনি পাবেন কি না বুঝতে পারছি না। কে জানে হয়তো চিঠি পৌঁছবার আগেই সুস্থ হয়ে ফিরে যাবেন। আগ্রহ নিয়ে এই চিঠি লিখছি, আপনি তা না পেলে খুব কষ্টের ব্যাপার হবে।*

*বিনীতা*
*অপালা*

সারা রাত ফিরোজ ঘুমুতে পারল না।

কত বার যে চিঠিটা পড়ল! প্রতিবারই মনে হল এটা তো আগে পড়া হয় নি। এ্যাটেনডিং ফিজিশিয়ান এক সময় বললেন, 'আপনি এমন ছটফট করছেন কেন? কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি?'

'জ্বি হচ্ছে। অস্থির-অস্থির লাগছে।'

'অস্থির-অস্থির লাগার তো কোনো কারণ দেখছি না। অসুখ সেরে গেছে, কাল-পরশুর মধ্যে রিলিজ অর্ডার হবে। আসুন, আপনাকে একটা ট্রাংকুলাইজার দিয়ে দিই।'

'একটায় কাজ হবে না, বেশি করে দিন।'

'আপনার কী হয়েছে বলুন তো?'

'খুব আনন্দ হচ্ছে ডাক্তারসাহেব।'

ফিরোজ ঘুমুতে গেল শেষরাতের দিকে। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। নাশতা নিয়ে এসেছে। দরিদ্র দেশের হাসপাতালের তুলনায় বেশ ভালো নাশতা। দু' পিস রুটি, একটা সেদ্ধ ডিম, একটা কলা, এক গ্লাস দুধ। নাশতা যে দিতে আসে, সে ট্রে নামিয়ে দিয়েই চলে যায় না। অপেক্ষা করে। কোনো রুগী যখন বলে—'ভালো লাগছে না, কিছু খাব না', তখন যে বড় খুশি হয়। ট্রে উঠিয়ে নিয়ে যায়। আজ তাকে খুশি করা গেল না। ফিরোজের খুব খিদে পেয়েছে। জানালা গলে শীতের রোদ এসেছে। খুবই ভালো লাগছে সেই রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতে। বেড নাম্বার চল্লিশের বুড়ো রুগীটি খুব কষ্ট পাচ্ছে। গোঙানির মতো শব্দ করছে। গভীর বেদনায় ফিরোজের মন ভরে গেল। তার ইচ্ছে করতে লাগল, রুগীর মাথার কাছে গিয়ে বসে। মাঝে-মাঝে পৃথিবীর সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ফিরোজ সত্যি-সত্যি বেড নাম্বার চল্লিশের দিকে এগিয়ে গেল। নরম গলায় বলল, 'আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

দরজা খুলল বড় মেয়েটি।

অপালা এর নাম জানে না। শুধু এর কেন, কারোরই নাম জানে না। আজও হয়তো জানা হবে না। অপালা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'ভেতরে আসব?' বড় মেয়েটি হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। শুধু দরজা ছেড়ে একটু সরে গেল। অপালা বলল, 'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম সোমা।'

'তোমারই কি বিয়ে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'বিয়েটা যেন কবে? আমার তারিখটা মনে নেই। কার্ড হারিয়ে ফেলেছি।'

'এগার তারিখ।'

'আমি আবার আসায় তুমি কি রাগ করেছ?'

'রাগ করব কেন?'

সোমা অপালার কাঁধে হাত রাখল। অপালা বলল, 'তুমি কি আমার বড়, না ছোট?'

সোমা সে-কথার জবাব দিল না। হালকা গলায় বলল, 'এস, ভেতরে এসে বস।

'বাসায় কেউ নেই? কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।'

'ওরা বাজারে গিয়েছে।'

'বিয়ের বাজার?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মা? উনি যান নি?'

'মা অসুস্থ, এখন ঘুমুচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে এস।'

তারা ভেতরের দিকে একটা ছোট্ট ঘরে এসে দাঁড়াল। দু' দিকে দু'টি চৌকি পাতা। একটা পড়ার টেবিল। সুন্দর করে গোছানো।

'এটা তোমার ঘর?'

'হ্যাঁ।'

'কে কে শোয় এখানে?'

'আমরা চার বোন। দু' জন দু' জন করে। তুমি বস।'

অপালা বসল। বসতে-বসতে বলল, 'শাড়িটা কি তোমার পছন্দ হয়েছে?'

সোমা এবারও হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। সে বসেছে অপালার মুখোমুখি। কিন্তু এক বারও অপালার দিকে তাকাচ্ছে না। মাথা নিচু করে আছে।

'যে-ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে তাকে কি তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ছেলেটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'না।'

'পছন্দ হয় নি কেন?'

'সোমা উত্তর দিল না। তার মুখ ঈষৎ কঠিন হয়ে গেল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। অপালা বলল, 'আচ্ছা, আমরা দু' জন কি যমজ বোন? দু' জন দেখতে অবিকল এক রকম, তাই না?'

সোমা এবারও চুপ করে রইল।

'আমার মনে হচ্ছে, আমরা যমজ বোন। ছোটবেলায় আমাদের বোধহয় একই রকম জামা-জুতো পরানো হত। হত না?

অপালা লক্ষ করল, সোমা কাঁদছে। নিঃশব্দ কান্না। মাঝে-মাঝে তার শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। গালে সূক্ষ্ম জলের রেখা।

'সোমা।'

'বল।'

'আমার কী নাম ছিল তখন? আমার কী ধারণা, জান? আমার ধারণা, সোমার সঙ্গে মিলিয়ে আমার নাম ছিল রুমা।'

সোমা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। সে বোধহয় চোখে কাজল দিয়েছিল, সারা মুখে কাজল লেপ্টে গেল।

'তোমার চোখ তো এমনিতেই সুন্দর, কাজল দিতে হবে কেন? আমাদের দু' জনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর? তোমাদের ঘরে বড় আয়না আছে? এস না, দু' জন পাশাপাশি দাঁড়াই।'

সোমা যেভাবে বসেছিল, সেভাবেই বসে রইল। অপালা অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমি যদি ফিরে আসি, তাহলে কার সঙ্গে ঘুমুবো? তোমার সঙ্গে?

ভেতর থেকে সোমার মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কে কথা বলে? কে ওখানে?'

সোমা বলল, 'কেউ না মা, কেউ না।'

'আমি স্পষ্ট শুনলাম।'

ভদ্রমহিলা নিজে-নিজেই বিছানা থেকে উঠলেন। পা টেনে-টেনে সোমাদের ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অপালা বলল, 'আপনি ভালো আছেন?'

এই বলেই সে অস্পষ্টভাবে হাসল। ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। টলে পড়ে যাচ্ছেন। সোমা ছুটে গিয়ে তার মা'কে ধরল। একা সে সামলাতে পারছে না। সে তাকাল অপালার দিকে। অপালা নড়ল না, যেভাবে বসে ছিল, সেভাবেই বসে রইল। সোমা বলল, 'তুমি একটু পানি এনে দেবে? মুখে পানির ছিটা দেব।'

অপালা উঠে দাঁড়াল। হালকা পায়ে বারান্দায় চলে এল। ঐ তো পানির কল। মগে করে পানি নিয়ে আসা যায়। সে পানির কলের দিকে গেল না। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে এল। তার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কান্না আসছে না।

ফখরুদ্দিন সাহেব ঘন্টাখানেক আগে এসে পৌঁছেছেন। হেলেনারও টিকিট ছিল। তিনি আসতে পারেন নি। ডাক্তাররা শেষ মুহূর্তে ঠিক করেছেন হার্টে বাই পাস সার্জারির প্রয়োজন, এবং তা অল্পদিনের মধ্যেই করতে হবে। ফখরুদ্দিন সাহেব সব ব্যবস্থা করে এসেছেন। দিন সাতেকের মধ্যে তিনি অপালাকে নিয়ে ফিরে যাবেন।

বাড়িতে পা দিয়েই তিনি মেয়ের খোঁজ করলেন। মেয়ে বাড়িতে নেই। কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারে নি। গাড়ি নিয়ে যায় নি। আজকাল প্রায়ই গাড়ি ছাড়া বের হয়। ফখরুদ্দিন সাহেব কিছুই বললেন না। সারপ্রাইজ দেবার জন্যে খবর না-দিয়ে এসেছেন। সেই সারপ্রাইজটি দেয়া গেল না।

তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলেন। পর-পর তিন কাপ বিস্বাদ কালো কফি খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিচে নেমে এলেন। নিশানাথবাবুর সঙ্গে আগেই তাঁর দেখা হয়েছে। তিনি কোনো কথা বলেন নি, এখন বললেন।

'কেমন আছেন?'

'জ্বি স্যার, ভালো।

'বসার ঘরটির এই অবস্থা করেছে?'

'অপালা মা খুব পছন্দ করেছে।'

'তার জন্যে এ-রকম ঘর একটা সাজিয়ে দেয়া যাবে। আপনি এক্ষুণি আগের ডেকোরেশনে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করুন।'

'স্যার, করছি।'

'আর্টিস্ট লোকটি কি প্রায়ই এ-বাড়িতে আসে?'

'কার কথা বলছেন স্যার?'

'যে এই অদ্ভুত ডেকোরেশন করেছে, তার কথাই বলছি।'

'জ্বি-না স্যার।'

'আপনি না-জেনে বলছেন। দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে আসুন।'

নিশানাথবাবু ছুটে গেলেন। দারোয়ানের কাছে একটা বড় খাতা থাকার কথা। সেখানে সে লিখে রাখবে কে আসছে কে যাচ্ছে। কখন আসছে কখন যাচ্ছে। দারোয়ান খাতা নিয়ে এল। ফখরুদ্দিন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'যাও, আমার ঘরে রেখে এস। নিশানাথবাবু।'

'জ্বি স্যার।'

'আপনার স্ত্রী এখানে কেন?'

'অপালা মা একা-একা থাকে.....।'

'সে কি বলেছিল তাঁকে আনবার কথা?'

'জ্বি-না স্যার।'

'তাহলে.....?'

নিশানাথবাবু ঘামতে লাগলেন। ফখরুদ্দিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'খবরের কাগজে এত কেচ্ছা-কাহিনী ছাপা হল, আপনারা ছিলেন কোথায়? পি-আর-ও সাহেবকে আসতে বলুন। যে-সব পুলিশ অফিসার এই ঘটনার তদন্ত করছেন, তাঁদেরকে খবর দিন যে আমি এসেছি। তাঁরা ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক এক ঘন্টার মধ্যেই চলে এলেন। পুলিশ অফিসার বলে মনে হয় না, অধ্যাপক-অধ্যাপক চেহারা। পায়জামা-পাঞ্জাবির ওপর একটা শাল চাপানো। শাল গায়ে দিয়ে কেউ অপরাধের তদন্ত করতে আসে! ফখরুদ্দিন সাহেব বিরক্তি চেপে রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

'কি জানতে চান আমার কাছ থেকে, বলুন?'

'একটা তারিখ আপনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই। আসামী বলছে, সে আপনার নির্দেশে এই কাজ করেছে। কোন তারিখে সে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে, তাও সে বলেছে। আমরা দেখতে চাই, ঐ তারিখে আপনি দেশে ছিলেন কি না।'

'আমার কাছ থেকেই জানতে চান?'

'জ্বি স্যার।'

'এটা একটা কাঁচা কাজ হচ্ছে না কি? এয়ারপোর্টে কাগজপত্র দেখলেই তো তা জানতে পারেন। আমার মুখের কথার চেয়ে ঐ-সব প্রমাণ নিশ্চয়ই অনেক মূল্যবান।'

'তাও স্যার করা হবে। আপনার একটা স্টেটমেন্ট নেব।'

'ভালো কথা, নেবেন। আপনার নাম কি?'

'রশিদ। আব্দুর রশিদ।

'শুনুন রশিদ সাহেব, এই ধরনের কোনো কিছু আমার বলার ইচ্ছা যদি থাকে, তাহলে আমি কি তা সরাসরি বলব? অন্যদের দিয়ে বলাব। এমন একটা কাঁচা কাজ কি আমি করতে পারি?'

'মাঝে-মাঝে খুব পাকা লোকও স্যার কাঁচা কাজ করে ফেলে।'

'হ্যাঁ, তা করে। কথাটা আপনি ভালোই বলেছেন। ওয়েল সেইড।'

পুলিশ অফিসার আধ ঘন্টা সময় নিয়ে স্টেটমেন্ট নিলেন। তাঁকে চা-বিসকিট কিছু দেয়া হল না। ভদ্রলোক চলে যাবার পরপরই পি.আর.ও. আবসার সাহেবকে ফখরুদ্দিন সাহেব ডেকে পাঠালেন।

'আবসার সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'পুলিশ অফিসার আব্দুর রশিদ সম্পর্কে খোঁজখবর নিন। লোকটির টাকা নেয়ার অভ্যেস আছে কি না দেখুন। পুলিশ অফিসারদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার ত্যাঁদড় ধরনের থাকে। টাকাপয়সা নেয় না। তবে আমার ধারণা, এ নেয়। এর গায়ের শালটি বেশ দামি। বেতনের টাকায় এ-রকম শাল কেনার কথা নয়।'

'আমি স্যার খোঁজ নেব।'

'আজ সন্ধ্যার মধ্যে নেবেন। ইনভেসটিগেশন টীমে আর কে-কে আছে দেখুন। ডি.আই.জি. রহমতউল্লাহ্ সাহেব এখন কোথায় আছেন, কোন সেকশনে, তাও দেখবেন।'

'জ্বি স্যার।'

'আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমি এই সমস্যার পুরো সমাধান চাই।'

'জ্বি স্যার।'

'আপনি এখন যান।'

'অফিসে আসবেন স্যার?'

'হ্যাঁ। তিনটার দিকে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

দুপুরে ফখরুদ্দিন সাহেব একা-একা ভাত খেলেন। অপালা এখনো ফেরেনি। ভাত খেতে-খেতে দারোয়ানের দিয়ে যাওয়া খাতাটি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। ফাঁকে-ফাঁকে গোমেজের সঙ্গে রান্নাবান্না নিয়ে গল্প করলেন। এটি তাঁর পুরনো অভ্যেস।

'গোমেজ।'

'জ্বি স্যার।'

'পৃথিবীর সব দেশে রান্নায় পনির ব্যবহার করে, বাংলাদেশে কেন করে না?'

'আমি তো স্যার বলতে পারব না।'

'এমন তো নয় যে এ-দেশে পনির তৈরি হত না। হাজার-হাজার বছর ধরে পনির তৈরি হচ্ছে। হচ্ছে না?'

'জ্বি স্যার।'

'আমাদের দেশি রান্নায় খানিকটা পনির দিয়ে দিলে কেমন হবে বলে তোমার ধারণা?'

'আমি তো স্যার বলতে পারছি না।'

'এক বার দিয়ে দেখবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

তিনি বিশেষ কিছু খেতে পারলেন না। কিছুদিন ধরেই তাঁর খিদের সমস্যা দেখা দিডয়েছে।

'গোমেজ।'

'জ্বি স্যার।'

'লাঞ্চের পর কাউকে তুমি মার্টিনি খেতে দেখেছ?'

'জ্বি স্যার, দেখেছি। মেক্সিকান এক সাহেবকে দেখেছি।'

'একটা মার্টিনি তৈরি কর তো।'

মার্টিনি খেয়ে তাঁর শরীর আরো খারাপ লাগতে লাগল, তবু তিনি ঠিক তিনটায় অফিসে গেলেন। ডেকে পাঠালেন ঢাকা ব্রাঞ্চের এ. জি. এম. মোস্তফা সাহেবকে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'মোস্তফা, আমার ধারণা যাবতীয় ঝামেলার পিছনে আপনি আছেন।'

'এইসব আপনি কী বলছেন স্যার!'

'আমি ঠিকই বলছি। ভুল বললে এত দূর আসতে পারতাম না, অনেক আগেই মুখ থুবড়ে পড়ে যেতাম। আপনি আপনার চার্জ বুঝিয়ে দিন।'

'স্যার, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন।'

ফখরুদ্দিন সাহেব কোটের পকেট থেকে বরখাস্তের চিঠি বের করলেন। এই চিঠি তিনি ইংল্যাণ্ড থেকেই টাইপ করে নিয়ে এসেছেন।

চিঠি হাতে মোস্তফা দাঁড়িয়ে, তিনি তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পি·এ·-কে বললেন, 'বাসায় টেলিফোন করে দেখ তো আমার মেয়ে ফিরেছে কি না।

পি.এ. জানাল এখনো ফেরে নি। ফখরুদ্দিন সাহেবের কপালে সূক্ষ্ম একটা ভাঁজ পড়ল। সেই ভাঁজ স্থায়ী হল না। তিনি পি.এ.-কে বললেন, 'গাড়ি বের করতে বল, আমি কারখানা দেখতে যাব। ইউনিয়নের নেতাদেরও খবর দিতে বল—আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব।'

'আপনার ওখানে এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না স্যার।'

'আমাকে উপদেশ দেয়া তোমার কাজের কোনো অঙ্গ নয় বলেই আমি জানি। তোমাকে যা করতে বলেছি, কর।'

'স্যার, এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।'

'গুড। ভেরি গুড।'

হাজি সাহেবের স্ত্রী ভিজিটার্স আওয়ারে ফিরোজকে দেখতে এসেছেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ভদ্রমহিলার গায়ে বোরকা নেই। ফিরোজ তাঁকে আগে দেখে নি। সে অবাক হয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে চিনতে পারছি না।'

ভদ্রমহিলা একগাদা ফলমূল নিয়ে এসেছেন। এর সঙ্গে আছে একটা হরলিকস, একটা ওভালটিন। তিনি বেশ সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি হাজি সাহেবের স্ত্রী।'

'ও আচ্ছা। বসুন বসুন।'

'বেশিক্ষণ বসতে পারব না। হাসপাতালে ফিমেল ওয়ার্ডে আমাদের এক জন রুগী আছে, তাকে দেখতে যাব। তোমাকেও চট করে দেখে গেলাম।'

'এইসব খাবারদাবার আমার জন্যে এনেছেন, না ওনার জন্যে?'

ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন। ভদ্রমহিলার এই হাসি ফিরোজের পছন্দ হল। রসবোধ আছে। মেয়েদের এই জিনিসটা একটু কম। সাধারণ রসিকতাতেও এরা রেগে যায়।

'আপনি আমাকে দেখতে আসবেন, এটা তো স্বপ্নেও ভাবি নি।'

'কেন দেখতে আসব না? শুধু আমি একা না, আমার মেয়েও এসেছে।'

'সে- কী।'

'ভেতরে আসতে লজ্জা পাচ্ছে—বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক দাঁড়িয়ে, আমি আমার রুগী দেখে আসি।'

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। তাঁর ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা। ফিরোজ বাইরে এসে দেখল সমস্ত বারান্দা আলো করে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। এত সুন্দর হয় মানুষ!

'এই মেয়ে, তুমি একা-একা দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, ভেতরে এস।'

সে সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হল। তার গায়ে হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি। মাথায় ঘোমটা দেয়ার জন্যে কেমন বউ-বউ লাগছে।

'বোরকা কোথায় তোমার?'

মেয়েটিও তার মায়ের মতো ভঙ্গিতে হাসল।

'এস, বস।'

বেডের সামনে একটা খালি চেয়ার। সে সেখানে বসল না। বিছানায় মাথা নিচু করে বসে রইল।

'তুমি কি আমাকে দেখতে এসেছ, না আরেক জন যে রুগী আছে, তাকে দেখতে এসেছ?'

মেয়েটি বিস্মিত গলায় বলল, 'আর তো কোনো রুগী নেই।'

ফিরোজ কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু-একটা বলতে ইচ্ছে করছে। বড় মায়া লাগছে মেয়েটির জন্যে।

'তুমি চা খাবে?'

'জ্বি-না।'

'খাও-না এক কাপ। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। এখানে একটা বয় আছে, ওকে বললেই নিচ থেকে চা এনে দেয়।'

'বলুন।'

ফিরোজ চায়ের কথা বলে এল। মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে রুগীদের দিকে দেখছে।

'হাসপাতাল নিশ্চয়ই তোমার খুব খারাপ লাগে, তাই না?'

'জ্বি–না। অনেক দিন আমি হাসপাতালে ছিলাম, হাসপাতাল আমার ভালোই লাগে। আপনার অসুখ এখন সেরে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

চা এসে গেল। মেয়েটি ছোট–ছোট চুমুকে চা খাচ্ছে। বার–বার তাকাচ্ছে ফিরোজের দিকে। এখন আর সেই দৃষ্টিতে কোনো লজ্জা আর সঙ্কোচ নেই। ফিরোজ আন্তরিকভাবেই বলল, 'তুমি এসেছ, আমার খুব ভালো লাগছে।'

মেয়েটি অত্যন্ত মৃদু স্বরে প্রায় ফিস–ফিস করে বলল, 'অপালা বলে যে–মেয়েটি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, ওকে আপনি কীভাবে চেনেন?'

'হঠাৎ করে পরিচয়। ও আমাকে সুন্দর একটা চিঠি লিখেছে, তুমি কি ঐ চিঠিটা পড়বে?'

'জ্বি–না।'

'তুমি পড়, তুমি পড়লে আমার ভালো লাগবে।'

ফিরোজ চিঠি বের করল। মেয়েটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী সুন্দর স্বচ্ছ চোখ। শুধু চোখের দিকে তাকালেই যেন এই মেয়েটির অনেকখানিই দেখে ফেলা যায়।

বিকেল হয়ে আসছে। দিনের আলো কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। চেনা পৃথিবীও এই আলোতে অচেনা হয়ে যায়।

ফখরুদ্দিন সাহেব বাগানে চেয়ার পেতে বসে আছেন। তাঁকে চা দেয়া হয়েছে। তিনি চা খাচ্ছেন না। তাঁর পায়ের কাছে অরুণা ও বরুণা। তিনি বরুণার পিঠ মাঝে–মাঝে চুলকে দিচ্ছেন। তাঁর কাছেই গোমেজ দাঁড়িয়ে। তাকে তিনিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এখন কিছু বলছেন না। গোমেজ যেতে পারছে না, অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'গোমেজ।'

'জ্বি স্যার।'

'ক'টা বাজে বল তো?'

'সাড়ে চারটা বাজে স্যার।'

'মাত্র সাড়ে চার, কিন্তু চারদিক এমন অন্ধকার হয়ে আসছে কেন? সূর্য ক'টার সময় ডোবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না স্যার।'

'খবরের কাগজে দেখ তো ওখানে দেয়া আছে কি না। সানসেট এবং সানরাইজ যদি দেয়া না থাকে, তাহলে আবহাওয়া অফিসে টেলিফোন করবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'ঘট–ঘট শব্দ হচ্ছে কিসের?'

'বসার ঘরটা নতুন করে সাজানো হচ্ছে স্যার।'

'ওদের নিষেধ করতে বল। আমার মেয়ে পছন্দ করে সাজিয়েছে ওটা, যেমন আছে তেমন থাকুক।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

গোমেজ চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে বলল, 'আপাকে কি খুঁজতে বের হব?'

'না।'

ফখরুদ্দিন সাহেব অরুণার পিঠ চুলকে দিতে লাগলেন। বাগান এখন প্রায় অন্ধকার। তাঁর শীত লাগছে, তবু তিনি বসেই আছেন। আকাশে একটি-দু'টি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। গোলাপ-ঝাড় থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি সৌরভ।

অপালা বাড়ি ফিরল সন্ধ্যা মেলানোর পর। সে ভেবেছিল, গেটের পাশে সবাই ভিড় করে থাকবে। তা নয়, গেট ফাঁকা। অন্য সময় তালা দেয়া থাকে, আজ তাও নেই। দারোয়ান টুলের ওপর বসে-বসে ঝিমুচ্ছে। অপালাকে দেখে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু কিছু বলল না।

অপালা বারান্দায় উঠে এসে প্রথম লক্ষ করল বাগানে বেতের চেয়ারে কে যেন বসে আছে। বাগানের আলো জ্বলছে না। জায়গাটা অন্ধকার। সিগারেটের আগুন ওঠানামা করছে। অপালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকল, 'বাবা!'

ফখরুদ্দিন সাহেব উত্তর দিলেন না। সিগারেট ছুঁড়ে ফেললেন। অপালা ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বালিকার মতো শব্দ করে কাঁদতে শুরু করল। ফখরুদ্দিন সাহেবের একটা হাত মেয়ের পিঠে। তিনি গাঢ় স্বরে বার-বার বলছেন, 'মাই চাইল্ড। মাই চাইল্ড।'

অপালা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'কখন এসেছ?'

'এই তো সকালে। তুমি সারা দিন কোথায় ছিলে?'

'নানান জায়গায় ছিলাম। তুমি কেমন আছ বাবা?'

'ভালো। আমি খুব ভালো আছি।'

'ঠাণ্ডার মধ্যে এখানে বসে আছ কেন?'

'তোমার জন্যে বসে আছি।'

'মা আসে নি, তাই না?'

'কী করে বুঝলে?'

'মা এলে সেও তোমার সঙ্গে বসে থাকত। তুমি এসেছ, বাবা, আমার খুব ভালো লাগছে।'

অপালা আবার ফোঁপাতে শুরু করল।

'মা এল না কেন?'

'ডাক্তাররা এখন বলছে, বাই পাস সার্জারি লাগবে।'

'একেক সময় এরা একেক কথা বলে কেন?'

'কি জানি, কেন!'

'বাবা এস, তোমাকে আমাদের বসার ঘরটা দেখাই, কী সুন্দর যে করেছে!'

ফখরুদ্দিন সাহেব এই ঘর আগেই দেখেছেন, তবু মেয়ের সঙ্গে ঢুকলেন।

'কেমন লাগছে বাবা?'

'ভালো।'

'শুধু ভালো? এর বেশি কিছু না?'

'না মা, এর বেশি কিছু না। তবে তোমার ভালো লাগছে, এটাই বড় কথা। আমার পুরনো চোখ। পুরনো চোখ সহজে মুগ্ধ হয় না।'

'বাবা, তুমি চা খেয়েছ?'

'হ্যাঁ। তবে আরেক বার খেতে পারি।'

'তুমি বাগানে গিয়ে বস, আমি তোমার জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।'

'তোমার বানাতে হবে না, তুমি আমার সঙ্গে এসে বস।'

'না, আমিই বানাব। আর শোন, একটা চাদর গায়ে দিয়ে যাও। নাও, আমারটা নাও।'

অপালা তার গায়ের নীল চাদর তার বাবার গায়ে জড়িয়ে দিল।

'তুমি রাতে কী খাবে, বাবা?'

'কেন?'

'আমি রান্না করব।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ফখরুদ্দিন সাহেব আবার বাগানে গিয়ে বসলেন। অরুণা এবং বরুণা দু' জন দু' পাশ থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর আনন্দে ফখরুদ্দিন সাহেবের চোখ ভিজে উঠছে। চোখের জল মানেই দুর্বলতা। তাঁর মধ্যে কোনোরকম দুর্বলতা থাকা উচিত নয়। এই অশ্রুবিন্দু এক্ষুণি মুছে ফেলা উচিত। কিন্তু তিনি মুছলেন না। চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। এই অন্ধকারে তাঁর দুর্বলতা কেউ দেখে ফেলবে না।

অপালা আসছে চা নিয়ে। বারান্দার আলো তার মুখে পড়েছে। কী সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে!

এখন দুপুর।

গরমের দুপুরে চারদিক ঝিম ধরে থাকে। ভূতে মারে ঢিল। কিন্তু শীতের দুপুরগুলো অন্য রকম। সকাল-সকাল একটা ভাব লেগে থাকে। রোদে পিঠ মেলে খবরের কাগজ হাতে বসে থাকতে চমৎকার লাগে।

ফিরোজ বেশিক্ষণ রোগে বসে থাকতে পারল না। ছায়া এসে পড়ল। তার ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। সমস্ত শরীর জুড়ে আরামদায়ক আলস্য। ফিরোজ লেপের ভেতর ঢুকে পড়ল। জানালার রোদ পড়ে লেপ ওম হয়ে আছে। কুসুম-কুসুম গরমে কী চমৎকারই না লাগছে। হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেয়েছে গত পরশু। শরীর এখনো পুরোপুরি সারে নি। আরামদায়ক একটা ক্লান্তি সারাক্ষণ তাকে ছুঁয়ে থাকে। সে ঘুমিয়ে পড়ল। সুন্দর একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল।

যেন অপালা তার ঘরে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নাড়ছে। কিন্তু তার ঘুম ভাঙছে না। অপালা বার-বার বলছে—প্লীজ উঠুন, প্লীজ উঠুন। এমন অসময়ে কেউ ঘুমায়? সে সব শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙছে না।

একসময় সত্যি-সত্যি সে জেগে উঠল। অবাক হয়ে দেখল ঘরের ভেতর শাড়িপরা এক জন কে যেন হাঁটছে। না, অপালা নয়, বড় আপা। ফিরোজের মনে হল, যা দেখছে তাও সত্যি নয়। স্বপ্নেরই কোনো অংশ। একমাত্র স্বপ্নের মধ্যেই এক জন মানুষ চট করে অন্য এক জন হয়ে যায়। সেই পরিবর্তনটাকেও মনে হয় খুব স্বাভাবিক।

তাজিন বলল, 'এই ওঠ্। আর কত ঘুমুবি? সন্ধ্যা বানিয়ে ফেললি তো!'

ফিরোজ ধড়মড় করে উঠল। এটা মোটেই স্বপ্ন নয়। ঐ তো বড় আপা।

'কখন এসেছিস?'

'অনেকক্ষণ। কত রকম শব্দটব্দ করছি। তোর ঘুম আর ভাঙেই না। এক বার চোখ মেলে খানিকক্ষণ দেখিস, তারপর আবার ঘুম। তোর শরীর এত খারাপ?'

'কিছুটা তো খারাপই।'

'তোকে নিতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমার বাসায়। একা আসি নি। দলবল নিয়ে এসেছি।'

'দলবল তো দেখছি না।'

'দেখবি কী করে, ওরা হাজি হাসেবের বাড়িতে মচ্ছবে লেগে গেছে।'

'মচ্ছবে লেগে গেছে মানে?'

'তোর বিয়ে নিয়ে ফাইন্যাল কথাবার্তা হচ্ছে।'

ফিরোজ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। কী বলবে ভেবে পেল না। তাজিন বলল, 'শোকে পাথর হয়ে গেলি মনে হচ্ছে! এ-রকম করে তাকাচ্ছিস কেন?'

'কথাবার্তা বলছে কে—দুলাভাই?'

'দুলাভাই কথাবার্তা বলার লোক? বড় মামা এসেছেন, ফুপা এসেছেন।'

'কী সর্বনাশ!'

'কাপড় পর্। চল্ নিচে যাই।'

'আমি নিচে যাব কেন?'

'আমি বলছি, এই জন্যে নিচে যাবি। সারা জীবন তুই চললি নিজের মতো। কারো কথা শুনলি না। বয়স তো তোর কম হল না। এখনো যদি লাইফের একটা পারপাস না পাওয়া যায়.....!'

'বক্তৃতার দরকার নেই।'

'নে, তোর জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি, এটা গায়ে দে।'

'পাঞ্জাবি গায়ে দেব কেন?'

'কী-রকম বোকার মতো কথা! তুই কি পাঞ্জাবি কখনো গায়ে দিস না? সারা জীবন তো গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবিই দেখলাম।'

ফিরোজ পাঞ্জাবি গায়ে দিতে-দিতে বলল, 'এখানে আসার ব্যাপারটা কি আগে থেকেই এ্যারেঞ্জ করা ছিল, না হঠাৎ ঠিক হয়েছে?'

'খবর দেয়া ছিল। তোকে কোনো খবর দেয়া হয় নি। কারণ, আমাদের সবার ভয়,

বিয়ের কথায় তুই পালিয়ে যেতে পারিস। আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই নি। তোর উপর নজর রাখার জন্যে লোক ছিল।'

তাজিন তরল গলায় হাসল।

'মন্টু সকাল থেকে তোর সঙ্গে ছিল না?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

'তার দায়িত্ব ছিল তোকে আটকে রাখা। নে, পায়জামাটা পর্। ভালো করে চুল আঁচড়া।'

'আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'নিচে নামলেই বুঝতে পারবি। এজিন কাবিন হবে। রুসমত সামনের মাসের সতের তারিখ।'

ফিরোজ চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল।

'এ-রকম করে তাকাচ্ছিস কেন? তুই নিজে আমাকে বলেছিস, মেয়েটিকে তোর খুব পছন্দ। আমাদের উপর রাগটাগ যা করবার, পরে করবি। এখন নিচে নেমে আয়। সবাই অপেক্ষা করছে।'

ফিরোজ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ছ'-সাতটা গাড়ি হাজি সাহেবের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা মাঠে সুন্দর-সুন্দর পোশাক-পরা একগাদা ছেলেপুলে ছোটাছুটি করে খেলছে। ফিরোজকে দেখতে পেয়েই তাজিনের সবগুলো মেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—'মামার বিয়ে, মামার বিয়ে।'

সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে। চারদিকে তার অপরূপ সোনালি আলোর শেষ ছটা। এই আলোয় এমনিতেই সবার মন কেমন করে। ফিরোজের হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হল-যদিও এই মেয়েটিকে সে সত্যি-সত্যি কামনা করে। সে নিশ্চিত, এই মেয়েটি তার জীবনে কল্যাণময়ীর ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাকে সারা জীবন ডুবিয়ে রাখবে গভীর ভালবাসায়।

ফখরুদ্দিন সাহেব অফিসে এলেন ঠিক দশটায়।

তিনি অফিসে পা দেয়ামাত্র বড় দেয়াল-ঘড়িতে ঘন্টা বাজতে শুরু করল। তিনি নিজের ঘরে না-ঢুকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব ক'টা ঘন্টা শুনলেন। এই অভ্যেস তাঁর দীর্ঘকালের। এর পিছনে তাঁর উদ্দেশ্যও খুব পরিষ্কার। অফিসের সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চান যে, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি চলেন, এবং আশা করেন অন্যরাও তাই করবে।

এখন তিনি যেখানে আছেন, সেটা একটা বড় হলঘরের মতো। সাত জন কর্মচারী পাশাপাশি টেবিলে কাজ করেন। সবাই এসে গেছে, শুধু ওয়ার্ড প্রসেসরের মেয়েটি আসে নি। এই মেয়েটিকে চার মাস আগে চাকরি দেয়া হয়েছে। তাকে প্রায়-সময়ই তিনি দেখেন না। এই মেয়েটির বয়স অল্প, একে ধমক দিতে তাঁর মায়া লাগে। আজ তাকে কিছু বলবেন।

'মুনিম সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'ঐ মেয়েটি আসে নি?'

'এসে পড়বে স্যার।'

'এসে পড়বে, সেটা কী করে বললেন? না-ও তো আসতে পারে। আজ হয়তো সে কোনো কারণে বাড়িতে ছুটি কাটাবে।'

মুনিম সাহেব চুপ করে রইলেন। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'বসুন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

মুনিম সাহেব তবু বসলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'মেয়েটির নাম মনে পড়ছে না। ওর কি নাম?'

'রেখা।'

'রেখা নিশ্চয়ই ডাকনাম। ভালো নাম কী?'

'সুলতানা। সুলতানা বেগম।'

'সুলতানা বেগমকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

তিনি নিজের ঘরে ঢুকলেন। তাঁর খাস বেয়ারা তৎক্ষণাৎ গরম এক কাপ চা তাঁর টেবিলে এনে রাখল।

'ইদ্রিস, কী খবর তোমার?'

'জ্বি স্যার, ভালো।'

'নিশানাথবাবুকে খবর দাও।'

ফখরুদ্দিন সাহেব চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্যাড টেনে নিলেন। আজ দুপুর একটা পর্যন্ত কী-কী কাজ করবেন, সেগুলো লিখে ফেলবেন। একেকটা কাজ শেষ হবে, তিনি লাল কালিতে সেটা কাটবেন। একটা বাজার আগেই সব কাটা হয়ে যাবে। আলাদা একটি ফাইলে সেই কাগজ তুলে রাখবেন। এই ফাইলটি ব্যক্তিগত। সবসময় নিজের কাছে রাখেন। আজ তিনি যা-যা লিখলেন তা হচ্ছে :

১. পুলিস তদন্ত : কতদূর কি হল?

২. চিটাগাং ব্রাঞ্চ অফিস : কেন পেপার মিল বন্ধ?

৩. ইউনিয়ন কর্মকর্তা জলিল : শায়েস্তা করতে হবে।

৪. মোস্তাক মিয়া : সে কী চায়?

৫. সুলতানা বেগম : কেন সে রোজ দেরি করে আসে?

৬. টেলিফোন : হেলেনা কেমন আছে?

ফখরুদ্দিন সাহেব লেখা অক্ষরগুলোর দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। পাঁচ নম্বর পয়েন্টটি কেটে দিলেন। অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

'স্যার, আসব?'

'আসুন নিশানাথবাবু। কেমন আছেন?'

'জ্বি স্যার, ভালো। কি জন্যে ডেকেছেন?'

'আপনি আমার আশেপাশেই থাকবেন। দরকার হলেই যেন পাই।'

'তা তো স্যার থাকি।'

'পুলিশ ইনকোয়ারি কোন পর্যায়ে আছে এটা আপ-টু-ডেট জানতে চাই।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'মোস্তাক মিয়া নামে এক লোককে আজ আমি সাড়ে এগারটায় আসতে বলেছি। সে এলে তাকে দক্ষিণের ঘরটায় বসাবেন।'

'সে স্যার এসে গেছে।'

'বেশ, ঐ ঘরে নিয়ে বসান। চা দিন। তার সঙ্গে কোনো গল্পগুজব করার প্রয়োজন নেই।'

'জ্বি-না স্যার। গল্পগুজব কেন করব?'

'ঠিক আছে, যান। পি.এ.-কে বলুন লন্ডনের সেন্ট লিউক হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমি হেলেনার ব্যাপারে খোঁজ নেব। পি·এ·-র কাছে টেলিফোন নাম্বার আছে।'

নিশানাথবাবু ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ামাত্র তিনি চার নাম্বার পয়েন্টটি কেটে দিলেন। ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে এগারটা বাজতে এখনো অনেক দেরি। তিনি মোস্তাককে সাড়ে এগারটায় আসতে বলেছেন ; তিনি ততক্ষণ অপেক্ষা করবেন।

দক্ষিণের যে-ঘরটিতে মোস্তাক মিয়া বসে ছিল, সেটা একটা মিনি কনফারেন্স রুম। অল্প কিছু লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কোনো গোপনীয় আলাপের প্রয়োজন হলে ঘরটি ব্যবহার করা হয়। একটিমাত্র দরজা—এটা বন্ধ করামাত্র বাইরে লাল আলো জ্বলে।

ফখরুদ্দিন সাহেব ঠিক সাড়ে এগারটায় সেই ঘরে ঢুকলেন। নিজেই হাত দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করলেন।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।'

তিনি সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে নিজে ধরালেন, একটি বাড়িয়ে দিলেন।

'নাও, সিগারেট নাও। নাও, নাও।'

তিনি নিজেই মোস্তাকের সিগারেট ধরিয়ে দিলেন।

'তুমি ভাল আছ?'

'জ্বি স্যার।'

তিনি লক্ষ করলেন, লোকটির সামনে চায়ের কাপ। চা ঠাণ্ডা হয়ে হালকা সর পড়েছে। সে চায়ে মুখ দেয় নি। ফখরুদ্দিন সাহেব ঠিক তার সামনের চেয়ারটিতে বসলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'তুমি আমার কাছে কী চাও?'

'স্যার, আমি তো কিছু চাই না।'

'না-চাইলে কেন তুমি আমার বাসায় এসেছিলে? কেন আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'আমি বড় মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছি, দাওয়াতের কার্ড নিয়ে.....'

'দাওয়াত দিতে গিয়েছিলে?'

'আমার মেয়েগুলো খুব ধরল। বড় মেয়েটা কান্নাকাটি করছিল।'

'শোন মোস্তাক মিয়া, তুমি এক সময় না-খেয়ে মরতে বসেছিলে। আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম, যে-কারণে আজ তুমি ফর্সা জামাকাপড় গায়ে দিচ্ছ, মেয়ের বিয়ে

উপলক্ষে কার্ড ছাপানোর পয়সাও তোমার হয়েছে।'

'আপনি আমাকে সাহায্য করেন নি স্যার।'

'তার মানে? পনের হাজার টাকা নগদ তোমার হাতে দিয়েছি। তোমাকে একটা দোকান করে দিয়েছি।'

'তার বদলে আমি আমার মেয়েটাকে দিয়েছি.....'

'কথা বলতেও শিখেছ মনে হচ্ছে।'

ফখরুদ্দিন সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। তিনি তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

'আমার মেয়ে গিয়েছে তোমার ওখানে?'

'জ্বি।'

'দু' বার গিয়েছে, তাই না?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।'

'তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমার মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কারণে সে নিদারুণ মানসিক কষ্টে আছে। মেয়েটাকে কেন কষ্ট দিলে?'

'ইচ্ছা করে দিই নি স্যার।'

'আমার মেয়েকে দেখে তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যারা কি খুশি হয়েছে? আমাকে বল, কেমন আনন্দ-উল্লাস হল।'

মোস্তাক মিয়া চুপ করে রইল। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'চুপ করে আছ কেন, বল? তোমার স্ত্রী কেমন খুশি?'

'ওর বোধশক্তি নেই স্যার—মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। কিছু বুঝতে পারে না। মেয়েটা যাওয়ার পর থেকে এই অবস্থা স্যার।'

'তুমি তো সুস্থই আছ। আছ না? তোমার মাথায় আশা করি কোনো গণ্ডগোল হয় নি। নাকি হয়েছে?'

মোস্তাক জবাব দিল না।

'মোস্তাক।'

'জ্বি স্যার।'

'আগামী কাল সকাল দশটার মধ্যে তুমি ঐ বাড়ি ছেড়ে দেবে। অন্য কোথাও চলে যাবে। মেয়ের বিয়ে দেয়া পর্যন্ত সময় তোমাকে আমি দিচ্ছি, বিয়ের পর-পর ঢাকা শহর ছেড়ে যাবে। তোমাকে যেন আমি ঢাকা শহরের ত্রিসীমানায় না দেখতে পাই।'

'কেন?'

'আমি চাচ্ছি, এই জন্যে। আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমাকে আমি দিচ্ছি, নাকি আরো বেশি চাই?'

'টাকা লাগবে না, আমি চলে যাব।'

'টাকা লাগবে না কেন? খুবই লাগবে। নাও, টাকাটা রাখ। আরেকটা সিগারেট নাও। নাও না, নাও। মোস্তাক মিয়া।'

'জ্বি স্যার।'

'আমি মানুষ খুব খারাপ, তুমি বোধহয় জান না। এই বার তোমাকে ক্ষমা

করলাম। দ্বিতীয় বার করব না। এখন তুমি যেতে পার। তুমি টাকা নিলে না?'

'টাকার স্যার আমার দরকার নেই।'

ফখরুদ্দিন সাহেব নিজের কামরায় ফিরে এলেন। মাথার যন্ত্রণা তাঁর ক্রমেই বাড়ছে। এমন শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে কোনো কিছুতেই মন বসানো যায় না। এক কাপ কালো কফির কথা বললেন। এক চুমুক দিয়ে তাও বিস্বাদ লাগল। তিনি বেল টিপলেন।

'লণ্ডনের লাইন এখনো পাওয়া যায়নি?'

'পাওয়া গিয়েছিল স্যার। আপনি তখন কনফারেন্স রুমে ছিলেন।'

'আবার চেষ্টা কর।'

নিশানাথবাবু ঢুকলেন।

'স্যার, পুলিশের ইনকোয়ারির ব্যাপারটা খোঁজ নিয়েছি। ফাইনাল রিপোর্ট এখনো হয় নি। রমনা থানার অফিসার ইন-চার্জ.....'

'এখন থাক। পরে শুনব।'

'আপনার কি শরীর খারাপ স্যার?'

তিনি জবাব দিলেন না। নিশানাথবাবু বললেন, 'আপনি স্যার বাসায় গিয়ে রেস্ট নিন।'

'আপনি আপনার কাজ করুন। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার বিচলিত হবার কোনো কারণ দেখছি না।'

'আদাব স্যার।'

ফখরুদ্দিন সাহেব ড্রয়ার খুলে দু'টি প্যারাসিটামল বের করলেন। ট্যাবলেট শুধু-শুধু গেলার কোনো উপায় নেই। পানির জন্যে বেল টিপতে তাঁর ইচ্ছে করছে না। আবার মাথার যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারছেন না।

'স্যার, আসব?'

'এস।'

'লাইন পাওয়া গেছে স্যার, কথা বলুন।'

পি. এ. দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। এই ঘরটি সাউণ্ডপ্রুফ। দরজা বন্ধ করে দিলে পৃথিবী থেকে এই ঘরটি আলাদা হয়ে যায়।

'হ্যালো, কে কথা বলছেন?'

'আমি ডক্টর মেজন।'

'আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। হেলেনা।'

'আমি হেলেনার ফিজিসিয়ান বলছি।'

'হেলেনা কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ। গুরুতর অসুস্থ—তাঁর হার্ট ফাংশান কাজ করছে না। লাইফ সেভিং ডিভাইস ব্যবহার করতে হচ্ছে।'

'ব্যাপারটা কখন ঘটল?'

'খুব বেশি আগে নয়। ন'-দশ ঘন্টা হবে। আপনি কি এগজ্যাক্ট সময় জানতে চান?'

'না, চাই না। রুগীর অবস্থা কেমন?'

'অবস্থা ভালো নয়।'

'ভালো নয় বলতে আপনি কী মিন করছেন?'

'আমি সবচেয়ে খারাপটাই আশঙ্কা করছি। হার্ট এ্যাণ্ড লাং মেশিনে রুগীকে আপনি দীর্ঘ সময় রাখতে পারবেন না। আমাদের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই।'

'আই সি।'

'তার উপর রুগীর ঠাণ্ডা লেগেছে। নিউমোনিয়ার লক্ষণ। ব্যাপারটা খুব ওমিনাস।

'বুঝতে পারছি। আপনি একটি টেলিফোন নাম্বার লিখুন, খারাপ কিছু হলে জানাবেন।'

ফখরুদ্দিন সাহেব তাঁর শোবার ঘরের নাম্বার দিলেন। এটি তাঁর ব্যক্তিগত নাম্বার। কাউকেই দেন নি। ডাইরেক্টরিতেও নেই। এখান থেকে তিনি টেলিফোন করেন। কখনো রিসিভ করেন না।'

ডক্টর মেজন বললেন, 'আপনি কি আর কিছু জানতে চান?'

'রুগিণীর কি জ্ঞান আছে?'

'না, নেই। উনি কমায় চলে গিয়েছেন।'

'জ্ঞান ফিরবে, এ-রকম কি আশা করা যায়?'

'না, যায় না। আমি খুবই দুঃখিত।'

'আপনার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই।'

ফখরুদ্দিন সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন, লণ্ডনে এই মুহূর্তে কাকে বলা যায়? তাঁর লণ্ডনে কোনো অফিস নেই। করার কথা মনে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে নি। একটা অফিস থাকলে এখন কাজে দিত। এখন সাহায্যের জন্যে অন্যদের কাছে যেতে হবে—যাদের লণ্ডনে নিজস্ব অফিস আছে, লোকজন আছে। ওদেরকে বলতে হবে, একটা ডেডবডি দেশে আসবে, দয়া করে সব ব্যবস্থা করুন। সেটা কোনো সমস্যা নয়।

তিনি পি· আর· ও·-কে ডেকে পাঠালেন।

'লণ্ডনে কাদের অফিস আছে, বলতে পারেন? দেশি কোম্পানির অফিস।'

'ব্যাংক-এর কথা বলছেন?'

'না, ব্যাংক নয়, বিজনেস অফিস।'

'মেফতা ইনজিনিয়ারিং-এর আছে। বাকিগুলো তো স্যার অফহ্যাণ্ড বলতে পারব না। একটা ওষুধ কোম্পানিরও আছে, নামটা মনে পড়ছে না।'

'বের করুন।'

'করছি স্যার। ব্যাপারটা কী, যদি জানতে পারতাম.....'

'ব্যাপারটা আপনার জানার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি এখন যান।'

পি· আর· ও· নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। ইউনিয়নের কয়েকজন নেতা এসে বসে আছে। স্যারের সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুবই নাকি জরুরি। অথচ পি· আর· ও· সাহেব এটা বলতে ভুলে গেলেন। দ্বিতীয় বার ঢুকে এটা বলতে তাঁর সাহসে কুলাল না। ইউনিয়নের নেতাদের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। এরা আজ দেখা করবেই।

ফখরুদ্দিন সাহেব তাঁর সামনের নোটটির দিকে আরেক বার চোখ বোলালেন। একটা প্রায় বাজতে চলল। আজ কিছুই করেন নি। চার নাম্বার পয়েন্টটা শুধু দেখা

হয়েছে। মোস্তাক মিয়া। লোকটির কিছু পয়সা হয়েছে মনে হয়। ঘাড় শক্ত হয়েছে। কত বড় সাহস, বলে কিনা—আপনি আমাকে সাহায্য করেন নি!'

'স্যার, আসব?'

তিনি চোখ তুলে অবাক হয়ে গেলেন। লালপাড় সি৫৫র শাড়ি পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোমটা টানা। মেয়েটি কে? পরিচিত মনে হচ্ছে।

'স্যার, আসব?'

'প্লীজ কাম ইন। কি ব্যাপার?'

'আপনি স্যার আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন।'

'আমি? কেন?'

'তাহলে বোধহয় স্যার আমার ভুল হয়েছে। আই অ্যাম সরি স্যার।'

'আপনি কে?'

মেয়েটি অত্যন্ত অবাক হয়ে বলল, 'স্যার, আমার নাম রেখা। সুলতানা বেগম।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি কনফিউজ করে ফেলেছি। বস, তুমি বস। চেয়ারটায় বস।

মেয়েটি আড়ষ্ট হয়ে বসল। ফখরুদ্দিন সাহেবের অস্বস্তির সীমা রইল না। তিনি অফিসের কোনো মহিলা কর্মচারীকে তুমি বলেন না। একে কেন বললেন? মেয়েটি বসে আছে চুপচাপ। তাকাচ্ছে ভয়ে-ভয়ে। এই মেয়েটি অফিসে রোজ দেরি করে আসছে। তাকে কিছু শক্ত কথা বলা দরকার, কিন্তু তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, কোনো শক্ত কথা তাঁর মনে আসছে না। কী কারণ থাকতে পারে?

'সুলতানা বেগম।'

'জ্বি স্যার।'

'আমি ভুলে আপনাকে তুমি বলেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'ছি-ছি স্যার, এটা আপনি কী বলছেন! আমি আপনার মেয়ের বয়সী।'

'মেয়ের বয়সী কথাটা উঠছে কেন? আমার কোনো মেয়ে নেই।'

বলেই ফখরুদ্দিন সাহেব চমকে উঠলেন। এটা তিনি কী বললেন! অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে গেল।

'সুলতানা বেগম, আপনি এখন যান।'

'আপনার কি স্যার শরীর খারাপ?'

'আমার শরীর ভালোই আছে।'

'যাব স্যার?'

ফখরুদ্দিন সাহেব উত্তর দিলেন না।

'স্লামালিকুম স্যার।'

মেয়েটি চলে যাবার পর তিনি বুঝতে পারলেন, কী কারণে একে তিনি কোনো কড়া কথা বলতে পারেন নি। এই মেয়েটি তাঁকে হেলেনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। হেলেনার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, কিন্তু মনে হল। সম্ভবত ঘোমটার কারণে। হেলেনার ঘোমটা দেয়ার বাতিক ছিল। তিনি কত বার বলেছেন, 'সবসময় ঘোমটা কেন?' হেলেনা হেসে বলেছে, 'ভালো লাগে, বউ-বউ মনে হয়।'

বউ সাজার এই শখ বিয়ের ত্রিশ বছরেও কাটল না।

অফিসের সবাই লক্ষ করল, তিনটা বেজে গেছে, তবু বড়সাহেব ঘর থেকে বের

হচ্ছেন না। সাড়ে তিনটার সময় ফখরুদ্দিন সাহেবের বেয়ারা ইদ্রিস এসে বলল, 'সুলতানা আপাকে স্যার আরেক বার একটু ডেকেছেন।'

সুলতানা ছিল না। তার আজ এক জায়গায় জন্মদিনের দাওয়াত—সে তার স্বভাবমতো কাউকে কিছু না-বলে আগে-আগেই চলে গেছে।

অপালার হাতে ক্যাডবেরি চকলেটের দু'টি চৌকো টিন।

সে বেশ কিছু সময় হল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কড়া নাড়তে কেন জানি ভয় লাগছে। ইচ্ছে করছে ফিরে চলে যেতে। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ অপালার কান্না পেয়ে গেল। সে বহু কষ্টে কান্না থামিয়ে কড়া নাড়ল। মিষ্টি গলায় ভেতর থেকে বলল, 'কে?'

অপালা জবাব দিল না। তার খুব ইচ্ছে করতে লাগল বলে, আমি তোমাদের এক জন বোন। তোমরা আমাকে বাইরে ফেলে দিয়েছ।

'কে, কে?'

অপালা ধরা-গলায় বলল, 'আমি।'

দরজা খুলে গেল। আজ বাড়িতে মেয়েরাই শুধু আছে, অন্য কেউ নেই। পাঁচটি পরীর মতো মেয়ে আগের মতোই অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছে। অপালা চকলেটের বাক্স দু'টি এগিয়ে ধরল। কেউ হাত বাড়াল না।

সোমা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসে নিল। অপালা বলল, 'এদের নাম কি?'

সোমা নিচু গলায় বলছে, কিন্তু কিছু অপালার মাথায় ঢুকছে না। তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। এর আগের দু' দিন এমন কষ্ট হয় নি। আজ কেন হচ্ছে?

সোমা বলল, 'তুমি বসবে না?'

'না, বসব না। আমি চলে যাব।'

'একটু বস। বাবা মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে, আসতে অনেক দেরি। একটু বস।'

অপালা বলল, 'ছোটরা জানে, আমি কে?'

'হ্যাঁ, জানে। কেন জানবে না? কত কথা আমরা বলি তোমাকে নিয়ে।'

মেজো মেয়ে, যার নাম বিনু, সে হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনি যখন হলি ক্রস স্কুলে পড়তেন, তখন কত দিন আমরা আপনাকে দেখার জন্যে ফার্মগেটে দাঁড়িয়ে থেকেছি।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বি। এক দিন আপনি গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে একটা রিকশার নিচে পড়ে গেলেন। আপনার সেটা মনে আছে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ আছে, মনে আছে। খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। সেদিন স্কুলে যাই নি।'

'হ্যাঁ, আপনি চলে গিয়েছিলেন। তখন কী হয়েছিল জানেন? আব্বার ঐ রিকশাওয়ালার উপর খুব রাগ হয়ে গেল। তখন আব্বা হঠাৎ ছুটে গিয়ে রিকশাওয়ালাকে একটা চড় মারলেন। তখন সব রিকশাওয়ালা আব্বাকে মারতে লাগল।

কী যে অবস্থা! আমরা কাঁদতে-কাঁদতে বাসায় এসেছি।'

'তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন?'

বিনু মাথা নিচু করে অল্প হাসল। সোমা বলল, 'বিনু ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'ও আবার কবি। কবিতা লেখে। বিনু, তোর কবিতার খাতাটা আন্ না।'

বিনু সঙ্গে-সঙ্গে খাতা নিয়ে এল। অপালার হাতে খাতা দিতেই অপালার চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল।

সোমা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। একটা হাত রেখেছে অপালার কাঁধে। অন্য বোনরা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে অপালাকে। শুধু বিনু ফ্রকের আঁচলে চোখ চাপা দিয়েছে। সোমা বলল, 'তোমরা সবাই যাও তো, অপালার জন্যে চা বানাও।'

মুহূর্তে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। সোমা বলল, 'আমাদের উপর তোমার খুব রাগ, তাই না?'

'না। রাগ করব কেন?'

'জান অপালা, তোমার ঘটনাটা জানার পর থেকে আমি বাবার সঙ্গে কথা বলি না। আজ চোদ্দ বছর। আমি একটি কথাও বলি না। তোমার বিশ্বাস হয়? বাবা এই জন্যে ঘরেও বিশেষ থাকে না।'

'তাঁর হয়তো উপায় ছিল না। যা করেছেন, বাধ্য হয়ে করেছেন।'

অপালা খুব কাঁদছে। কিছুতেই কান্না থামাতে পারছে না। সোমা তার পাশেই বসে আছে মূর্তির মতো। তার চোখ শুকনো। ছোটবেলা থেকেই সে কাঁদতে পারে না। কত দুঃখ-কষ্ট বয়ে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে, অথচ তার চোখে জল আসে নি। আজ তার খুব কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কান্না আসছে না।

রান্নাঘরে চার বোন মহা উৎসাহে রান্না চাপিয়েছে। এক জন আবার ময়দা বের করল। ছোট-ছোট হাতে বিনু ময়দা মাখছে। ময়দা দিয়ে সে কিছু-একটা বানাবে। কী বানাবে, তা এখনো জানে না। তাদের খুব আনন্দ হচ্ছে।

অপালা শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে।

সোমাদের বাড়ি থেকে বের হয়েছে অনেক আগে, কিন্তু এখনো তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। কত-কত জায়গায় সে গেল! একটি গলি ছাড়িয়ে অন্য একটি গলি, তারপর একটা বড় রাস্তা। আবার একটা গলি। একসময় সে একটা ফাঁকা মাঠের কাছে এসে পড়ল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলেও একদল ছেলেমেয়ে মাঠে খেলছে। কী সুন্দর লাগছে তাদের!

বিচিত্র ধরনের খেলা। একটা ছেলে ছুটতে থাকে—সবাই তার পিছনে ছোটে। একসময় ছেলেটা বসে পড়ে ছড়ার মতো কী-একটা বলে, অমনি দলের সবাই উল্টো দিকে ছুটতে থাকে। অপালা গভীর আগ্রহে ওদের খেলা দেখতে লাগল।

ফিরোজ বলল, 'তোমার নামটা গ্রাম্য ধরনের। এই যুগে লতিফা কারোর নাম হয়? নামটা আমি বদলে দেব।'

'কী নাম দেবেন?'

'আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে এখন থেকে তোমার নাম ফিরোজা। কি, পছন্দ হয়েছে?'

'উল্টোটা করলে কেমন হয়? আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে আপনার নাম হোক লতিফ।'

বলেই লতিফা খিল-খিল করে হেসে ফেলল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ফিরোজ। মেয়েরাও যে রসিকতা করতে পারে, বিশেষ করে এই মেয়ে, যার জীবন এ-পর্যন্ত বোরকার আড়ালে কেটেছে—তা ফিরোজ কল্পনাও করে নি।

'আপনি রাগ করলেন না তো?'

'না, রাগ করি নি। আপনি-আপনি করছ, এই জন্যে রাগ লাগছে।'

'এক দিনে কাউকে তুমি বলা যায়?'

'ইচ্ছা করলেই যায়। তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'দাঁড়াও, একটা রিকশা নিয়ে নিই।'

ফিরোজ রিকশার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। রিকশাওয়ালা পছন্দেরও একটা ব্যাপার আছে। এমন এক জনকে নিতে হবে, যে তাদের দু' জনের কথা কান পেতে শুনবে না। বুড়ো কোনো রিকশাওয়ালা। তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

অনেক ঝামেলা করে সে লতিফাকে বের করে এনেছে। হাজি সাহেব বাসায় থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব হত না। হাজি সাহেবকে অনেক কায়দা করে খিলগাঁয়ে পাঠানো হয়েছে। এই কাজটা করেছেন ফিরোজের শাশুড়ি। যদিও তিনি বার-বার বলেছেন—বিয়ে তো এখনো পুরোপুরি হয় নি। এখন দু' জনে একসঙ্গে বের হওয়া ঠিক না। কিন্তু এটা তাঁর মুখের কথা, কারণ হাজি সাহেবকে খিলগাঁয়ে পাঠানোর বুদ্ধিটা তাঁরই।

লতিফা বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

ফিরোজ হেসে বলল, 'আছে একটা জায়গা, এখন বলব না।'

'আমি জানি আপনি কোথায় যেতে চান।'

'তাই নাকি! বল তো কোথায়?'

'অপালা বলে আপনার যে চেনা এক জন আছেন, তাঁর বাসায়।'

বলতে-বলতেই লতিফা মুখ নিচু করে হাসল। ফিরোজ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি হাসছ কেন?'

'এমনি হাসছি। মাঝে-মাঝে আমার খুব হাসি পায়।'

'কই, আমার তো পায় না!'

'সব মানুষ তো আর এক রকম হয় না। সবাই যদি এক রকম হত, তাহলে এখন আর আপনি ঐ বাড়িতে যেতে চাইতেন না। আমাকে সঙ্গে নিয়েই বেড়াতেন।'

'এটা আবার কী ধরনের কথা?'

'আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন?'

ফিরোজ সিগারেট ধরাল। সে সত্যি-সত্যি রেগে গিয়েছে। রাগ কমানোর চেষ্টা করছে। ফিরোজের ধারণা ছিল, এই শান্ত স্নিগ্ধ চেহারার মেয়েটি সাত চড়েও কথা বলবে না। এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা তা নয়। মেয়েটা কথা বলতে পারে। কথা বলে খুব গুছিয়ে।

'লতিফা, তোমার একটা ভুল আমি ভেঙে দিতে চাই। অপালাদের বাসায় যাবার জন্যে আমি তোমাকে নিয়ে বের হই নি। তোমাকে নিয়ে বের হয়েছি একটু হাঁটব, কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসব। চট করে একটা ধারণা করা ঠিক না।'

লতিফা চুপ করে রইল। ফিরোজের মনে হল মেয়েটি কান্না চাপার চেষ্টা করছে। এ-রকম কড়া গলায় কথা বলা উচিত হয় নি। এই মেয়ে খুব আদরে মানুষ হয়েছে, যে-কারণে সে এত অভিমানী। কেঁদে ফেললেও অবাক হবার কিছু নেই, শুধু অবস্থাটা খুব অস্বস্তিকর হবে। রূপবতী একটা মেয়ে কাঁদছে, সে ভ্যাবলার মতো পাশে দাঁড়িয়ে—সন্দেহজনক চোখে সবাই তাকাবে।

'লতিফা।'

'জ্বি।'

'কেঁদে ফেলার চেষ্টা করছ নাকি?'

'যাতে কেঁদে না ফেলি, সেই চেষ্টা করছি।'

ফিরোজ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি কি সবসময় এ-রকম কথার পিঠে কথা বল, না আমার সঙ্গেই বলছ?'

'আপনার সঙ্গেই বলছি। আমি কথা খুব কম বলি।'

'তুমি তো মনে হচ্ছে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

'না, তুলব না। একসময় আমার কথা শুনে আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে।'

তারা একটা রিকশায় উঠল। ফিরোজ রিকশাওয়ালাকে অপালাদের বাড়ির দিকেই যেতে বলল। লতিফার গায়ে একটা চাদর। তার হাত চাদরের নিচে। ফিরোজ ভয়ে-ভয়ে লতিফার হাতে তার হাত রাখল। লতিফা ভীষণভাবে চমকে উঠেও সামান্য হাসল।

'লতিফা।'

'জ্বি।'

'অপালাদের বাসায় আমরা কেন যাচ্ছি, বল তো?'

'ওনাকে আপনার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, তাই যাচ্ছেন। তা ছাড়া হঠাৎ বিয়ে করে নিজেকে আপনার খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।'

'চুপ কর তো, কী বক-বক শুরু করলে? অপরাধী মনে করার কী আছে! আমি চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি? এই মেয়ের সঙ্গে যেদিন আমার পরিচয়, সেদিনই আমি তাকে বলেছি যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিকঠাক। যদি আমার কথা বিশ্বাস না-হয়, তাকেই জিজ্ঞেস করো।'

আজ দারোয়ান তাকে গেটে আটকাল না। রূপবতী একটি মেয়ে পাশে থাকার অনেক

রকম সুবিধা আছে। কাজের মেয়েটি যত্ন করে বসার ঘরে নিয়ে বসাল। তার কাছে জানা গেল, অপালা সারা দিন বাসায় ছিল না। এই কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে।

লতিফার চোখে বিস্ময়। এত বিশাল বাড়ি সে কল্পনাও করে নি। যা দেখছে তাতে মুগ্ধ হচ্ছে। এক সময় চাপা গলায় বলল, 'এদের বসার ঘরটা কত সুন্দর, দেখেছেন?'

'সুন্দর লাগছে তোমার কাছে?'

'খুবই সুন্দর! ইস, আমাদের যদি এ-রকম একটা বসার ঘর থাকত, তাহলে আমি আর কিচ্ছু চাইতাম না।'

'এই বসার ঘরটা আমার তৈরি করে দেয়া। ডিজাইন, ডেকোরেশন—সব আমার।'

'সত্যি।'

'হ্যাঁ, সত্যি। তুমি চাইলে এর চেয়ে সুন্দর একটা ঘর আমি তোমার জন্যে বানিয়ে দেব।'

'আমি চাই। আমি এক শ' বার চাই। ঐ ছবিটাও তোমার আঁকা?'

এই প্রথম লতিফা তুমি বলল। সে নিজেও তা বুঝতে পারল না। তার মুগ্ধ দৃষ্টি ছবিটির দিকে।

'ছবিটা ভালো লাগছে?'

'হুঁ।'

'কেন ভালো লাগছে?'

'তা তো জানি না।'

ফিরোজ মৃদু স্বরে বলল, 'আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এইটা। অনেক সময় আমাদের অনেক কিছু ভালো লাগে, কিন্তু কেন ভালো লাগে তা আমরা বুঝতে পারি না। বুঝতে চেষ্টাও করি না।'

'সবকিছু বুঝে ফেলাও ভালো না।'

ফিরোজ মনে-মনে হাসল। এই মেয়েটি দার্শনিক টাইপ নাকি? কত সহজে কঠিন-কঠিন কথা বলছে।

কাজের মেয়েটি ট্রেতে করে চা এবং নানান ধরনের খাবারদাবার নিয়ে এসেছে। সে চায়ের কাপ টেবিলে রাখতে-রাখতে মৃদু স্বরে বলল, 'আপার শরীরটা ভালো না। আপা আজকে একতলায় নামবে না। আপনেরা আরেক দিন আসেন।' ফিরোজের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। লতিফা বলল, 'আমি উপরে গিয়ে ওনাকে দেখে আসি?'

কাজের মেয়েটি বলল, 'জ্বি-না। বাইরের মানুষের উপরে উঠা নিষেধ আছে।' লতিফা চায়ের কাপে চিনি ঢেলে হালকা গলায় বলল, 'মিষ্টি হয়েছে কি না দেখ।' ফিরোজ কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে, যেন এই মুহূর্তে রেগেমেগে একটা কাণ্ড করবে। লতিফা মৃদু স্বরে বলল, 'চা না খেয়ে যাওয়াটা আরো খারাপ হবে। চা খাও, কিছুক্ষণ বস। কাপগুলো কি সুন্দর, দেখেছ? তুমি আমাকে এ-রকম এক সেট কাপ কিনে দিও।'

ফিরোজ চুপ করে আছে। লতিফা শাড়ির আঁচলে গা ভালো মতো জড়াতে- জড়াতে বলল, 'আজ বেশ শীত পড়েছে। তোমার শীত লাগছে না?'

এ–প্রশ্নেরও কোনো জবাব পাওয়া গেল না। ফিরোজ রিকশায় বসে আছে পাথরের মতো, তাকিয়ে আছে শূন্যদৃষ্টিতে। তার কিছুই ভালো লাগছে না। লতিফা চাপা গলায় বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি? তুমি শুধু নিজের দিকটাই দেখছ। নিশ্চয়ই ওনার কোনো সমস্যা হয়েছে। কেউ কি আর ইচ্ছা করে কাউকে অপমান করে?'

'চুপ করে থাক। তুমি বেশি বক–বক কর।'

'সবার সঙ্গে করি না। কোনোদিন করবও না। শুধু তোমরা সঙ্গে করব, রাগ কর আর যাই কর।'

লতিফা তার হাত রাখল ফিরোজের হাতে। সেই হাত কেঁপে–কেঁপে উঠছে। ফিরোজ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হয়েছে লতিফা?'

'কিছু হয় নি।'

কাঁদছ নাকি?'

'হ্যাঁ, কাঁদছি। তুমি এত লজ্জা পেয়েছ, তাই দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

ফিরোজের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ তো বড় অদ্ভুত মেয়ে! সত্যি–সত্যি কাঁদছে। ফিরোজ বিব্রত স্বরে বলল, 'কী শুরু করলে তুমি, কান্না থামাও তো!'

লতিফা ফোঁপাতে–ফোঁপাতে বলল, 'চেষ্টা করছি, পারছি না।'

ওরা চলে যাবার পরপরই খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অপালা নিচে নেমে এল। তাকে দেখে মনে হল, সে দীর্ঘ সময় নিয়ে সাজগোছ করেছে। গায়ে হালকা লাল রঙের শাড়ি। গলায় গাঢ় লাল রঙের রুবি–বসানো হার। কানের দুলের পাথর অবশ্যি রুবি নয়—স্বচ্ছ টোপাজ। লাল শাড়ির প্রতিফলনে সেগুলোও লালচে দেখাচ্ছে। অপালাকে দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি কোথাও বেরুবে।

বারান্দায় গোমেজ দাঁড়িয়ে ছিল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অপালা লাজুক গলায় বলল, 'আমাকে কেমন লাগছে?'

'খুব সুন্দর লাগছে আপা।'

'বাবা কোথায়?'

'বাগানে বসে আছেন।'

'আমাদের দু' কাপ চা দাও।'

অপালা হালকা পায়ে বাগানে নেমে গেল। বাগান অন্ধকার। বারান্দার বাতি নেভানো বলে সবকিছুই কেমন অস্পষ্ট লাগছে। ফখরুদ্দিন সাহেব অরুণা এবং বরুণাকে দু' পাশে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত চুরুট। অন্ধকারে চুরুটের আগুন ওঠানামা করছে। অপালা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

'অন্ধকারে বাগানে বসে আছ কেন বাবা?'

'এমনি বসে আছি, কিছু করার নেই।'

'তোমার শীত লাগছে না?'

'কিছুটা লাগছে।'

'এস, ঘরে এস। এই ঠাণ্ডায় তোমার পাশে বসতে পারব না।'

অপালার গলা সতেজ। কথায় ফুর্তির একটা ভঙ্গি, যা তার স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই মিশছে না। সে বড় একটা সাদা চন্দ্রমল্লিকা ছিঁড়ে খোঁপায় পরল।

'বসে রইলে কেন বাবা, এস।'

অপালা ফখরুদ্দিন সাহেবের হাত ধরল। তিনি বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'তোকে খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছে।'

'সবাই মুখ গোমড়া করে রাখলে চলবে? তোমার কারখানার ঝামেলা মিটেছে?'

'প্রায় মিটেছে। কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। আরো টাকা খরচ হবে, এই আর কি।'

'ধনী হবার কত সুবিধা, তাই না বাবা? সব সমস্যা চট করে মিটিয়ে ফেলা যায়।'

'গরিব হবারও সুবিধা আছে। গরিবদের এ-ধরনের কোনো সমস্যা থাকে না।'

অপালা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে হালকা গলায় বলল, 'তা ঠিক, গরিবদের একমাত্র সমস্যা কীভাবে বেঁচে থাকবে। এই বেঁচে থাকার জন্যে কত কাণ্ড এরা করে! নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়।'

ফখরুদ্দিন সাহেব হাতের চুরুট ছুঁড়ে ফেললেন। তাকালেন মেয়ের দিকে। অন্ধকারে অপালার মুখের ভাব দেখতে পেলেন না। শুধু মনে হল, মেয়েটির গলার স্বর হঠাৎ করে যেন খানিকটা বিষণ্ন হয়ে গেছে, এবং মেয়েটি নিজেও তা বুঝতে পেরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলতে।

তারা বসল বারান্দায়। গোমেজ চায়ের ট্রে নামিয়ে দিয়ে বাতি জ্বেলে দিল। অপালা চায়ে চিনি মেশাতে-মেশাতে বলল, 'আমাকে কেমন লাগছে বাবা?'

'সুন্দর লাগছে। তবে লাল চন্দ্রমল্লিকা হলে বোধহয় আরো ভালো লাগত।'

'না, তা লাগত না। কালো চুলের সঙ্গে সাদা ফুলের সুন্দর কন্ট্রাস্ট হয়। কালোর সঙ্গে লাল মিশ খায় না। তোমার চায়ে চিনি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। হঠাৎ আজ এত সাজের ঘটা?'

'ইচ্ছা করল, তাই। কারণ নেই কোনো।'

'চল, বাইরে কোথাও গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে আসি। যাবে?'

'কেন যাব না?'

'মন ভালো না লাগলে থাক।'

'মন ভালো লাগবে না কেন? আমার খুব ভালো লাগছে।'

রেস্তোরাঁতে অপালা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল। কথা বললেন ফখরুদ্দিন সাহেব। সবই ব্যাবসায়িক কথা। মোট সম্পদের একটা আবছা ধারণা দিতে লাগলেন। অপালা বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমাকে এ-সব কেন বলছ বাবা?'

'তোমাকে ছাড়া কাকে বলব? আমার শরীর ভালো না। যে-কোনো সময় কিছু-একটা হবে। তখন হাল ধরবে কে?'

অপালা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'মা'র কথা তুমি আমাকে অনেক দিন ধরেই কিছু বলছ না। তাঁর শরীর কি খুব খারাপ?'

'না তো! শরীর মোটামুটি ভালোই আছে।'

'না বাবা, ভালো নেই। আমি আজ খুব ভোরে হাসপাতালে টেলিফোন করেছিলাম। ডাক্তাররা বললেন, অবস্থা খুবই খারাপ। বাবা।'

'বল।'

'তুমি এখনো কেন এখানে বসে আছ? তুমি যাচ্ছ না কেন?'

অপালা খুব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, 'মা'র এখন জ্ঞান নেই, কিন্তু যদি জ্ঞান ফেরে, তখন মা এক জন প্রিয় মানুষের মুখ দেখতে চাইবে। মা তখন কাকে দেখবে?'

'রাইট। রাইট আসলেই তাই। মৃত্যুর সময় প্রিয়জনদের দেখতে ইচ্ছা করে। আমি এটা খুব ভালো জানি। আমার মাও তাই চেয়েছিল। আমি, আমি.....'

ফখরুদ্দিন সাহেব কথা শেষ করলেন না। অপালা বলল, 'চল উঠে পড়ি, আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না।'

রাত প্রায় একটার মতো বাজে। অপালা এখনো তার খোঁপা থেকে চন্দ্রমল্লিকা তুলে ফেলে নি। তার গায়ে এখনো লাল শাড়ি। গলার হার আগুনের মতো জ্বলছে। তাকে দেখাচ্ছে তার ডাইরিতে আঁকা নর্তকীর মতো। সেই রকম চোখ, সেই রকম মুখ। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা আগে অপালা লক্ষ করে নি। সে অনেকক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখল। ফিস-ফিস করে বলল, 'আয়নার এই মেয়েটি তো ভারি সুন্দর!' বলেই সে তাকাল তার ডাইরির ছবিটির দিকে। 'এত মিল আমাদের মধ্যে, কিন্তু আগে কেন এটা চোখে পড়ল না?' এই বলেই সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডাইরি খুলে ছোট-ছোট অক্ষরে লিখল—

"বাবা, তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই।"

তার কাছে মনে হল, এই লেখা পড়ে সবাই ভাববে, মেয়েটি কোন বাবার কথা বলছে? কেউ তা বুঝতে পারবে না। বোঝার কথাও নয়। বেশ চমৎকার একটা ধাঁধা। যে ধাঁধার উত্তর শুধু এক জনই জানে। সে সেই উত্তর কাউকে দিয়ে যাবে না। থাকুক-না খানিকটা রহস্য।

ঘরের বাতি নিভিয়ে অপালা টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে দিল। তার ডাইরির শেষ লেখাটি অতি দ্রুত লিখতে লাগল।

*ফিরোজ সাহেব,*

*আপনাদের দু' জনকে আমি জানালা দিয়ে আসতে দেখলাম। বিকেলবেলার আলোয় সবকিছুই ভালো দেখায়, কিন্তু আপনাদের দু' জনকে যে কী সুন্দর লাগছিল! আমি দেখলাম, আপনার বান্ধবী (নাকি স্ত্রী?) একটা হোঁচট খেলেন, আপনি সঙ্গে-সঙ্গে হাত দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে কী যেন বললেন, তারপর দু' জন অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। কী যে অপূর্ব একটি দৃশ্য! আনন্দে আমার চোখ ভিজে গেল। কত আনন্দ আমাদের চারদিকে, তাই না?*

*আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসি নি। কারণটি জানলেই আপনারা দু' জনই সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণটা হচ্ছে, কেন জানি গোড়া থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, আপনার এই বান্ধবীর ব্যাপারটা সব বানানো। মিথ্যা অজুহাতে আপনি বার-বার আমার কাছেই আসেন। কিন্তু তা তো নয়। এটা আমি কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারছিলাম না। আপনি আমাকে সত্যি কথা বলেছিলেন। আমিও সত্যি কথাই বললাম। আমি আপনাকে নিয়ে একটা বাড়িতে যেতে চেয়েছিলাম। সেটা আর সম্ভব হল না। তবে আপনাকে একটা মজার কথা বলি—যদি হঠাৎ কোনোদিন অবিকল আমার মতো কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, আপনি কিন্তু চমকে উঠবেন না। তার কাছে গিয়ে বলবেন—অপালা নামের খুব চমৎকার একটি মেয়ে ছিল। তাকে আমি চিনতাম। সেই মেয়েটি খুব দুঃখী ছিল, কিন্তু তার দুঃখের কথা সে কাউকেই কোনোদিন বলে নি। এবং কারো উপর তার কোনো রাগ নেই।*

*মেয়েটির ঠিকানা আমি আপনাকে দেব না। কারণ আমি জানি, একদিন-না-একদিন তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে। আপনি ভীষণ চমকে উঠবেন। কল্পনায় আপনার সেই চমকে ওঠার দৃশ্য আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমার খুব মজা লাগছে।*

ফখরুদ্দিন সাহেব ঘুমুতে যাবার আগে দু'টি ঘুমের ট্যাবলেট খান। সোনারিলের বড় একটা কৌটা তাঁর বিছানার পাশের সাইড–টেবিলে থাকে। আজ কৌটাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। হয়তো হাত লেগে নিচে পড়ে গেছে। খুঁজতে ইচ্ছে করছে না। তিনি বিছানায় উঠে বাতি নিভিয়ে দিলেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই রাতে তাঁর খুব ভালো ঘুম হল। চমৎকার একটা স্বপ্নও দেখলেন। নদী,বন, ফুল, পাখি নিয়ে স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যেই তিনি বুঝলেন, এটা স্বপ্ন—এর কোনো অর্থ নেই, তবু তাঁর মন গভীর প্রশান্তিতে ভরে গেল। অনেক দিন স্বপ্ন দেখা হয় না।।